প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
গ্রন্থপ্রকাশ
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
শ্রীশিশিরকুমার সরকার
শ্যামা প্রেস
২০বি, ভুবন সরকার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

সূচীপত্র



কবি, ফাল্গুনী রায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে

হুরতনের খিবি



কি গো বিরজুর-মা, নাচ দেখতে যাবে না ?

বিরজুর-মা রাঙাআলু কুটিয়ে বসে বসে আপন মনেই কুটছিল নিজের আঙ্গনে। সাত বছরের ছেলে বিরজু রাঙাআলুর বদলে থাপ্পড় খেয়ে আঙ্গনে লুটোপাটি করে সারা দেহে মাটি মাখছিল। চম্পিয়ার মাথায় পেত্নী ভর করেছে···আধ-আঙ্গন রোদ থাকতে সেই যে সাহু-বৌএর দোকানে ছোয়া-গুড় আনতে গেছে, তা এখনও ফেরেনি ; সাঁঝবাতির বেলা হয়ে গেল। আসুক আজ ফিরে! ধাড়ী ছাগলের গায়ে কুকুরমাছি এঁটে ছিল, বেচারা ছাগল থেকে থেকে লাফালাফি করছিল। বিরজুর-মা ছাগলের ওপর মনের রাগ মেটাবার অজুহাত খুঁজে বার করে।···বাড়ীর পেছন দিকে লঙ্কার পাকা গাছ। ঐ ছাগল ছাড়া কে আর খেয়ে-মুড়ে তছনছ করেছে! ছাগলকে মারার জন্য সে মাটির একটা ছোট ঢেলা সবে তুলেছে, এমন সময় প্রতিবেশী মাখনী পিসীর ডাক শোনা যায়—কি গো বিরজুর মা, নাচ দেখতে যাবে না ?

—বিরজুর-মার সামনে বাঁধন পেছনে টান যদি না থাকে তবেই তো ; পিসী!

গরম গোসায় নিভস্ত চোখা কথা পিসীর দেহে বিঁধে যায়, বিরজুর-মা হাতের ঢেলা পাশে ছুঁড়ে ফেলে···বেচারা ছাগলটাকে কুকুরমাছি বিরক্ত করছে। আ-হা. আয়···আয়। হর্‌-র-র-র। আয়-আয়!

বিরজু শোয়া অবস্থায় ছাগলটাকে এক লাথি কসিয়ে দেয়।

বিরজুর-মার ইচ্ছে হয়, গিয়ে ঐ লাঠি দিয়ে বিরজুর ভূত তাড়িয়ে দেয়; কিন্তু নিমগাছের কাছে দাঁড়ানো জলভরনিদের খিলখিল হাসি শুনে থেমে পড়ে। বলে—দাঁড়া, তোর বাপ বড্ড হাতছুট করে দিয়েছে তোকে! বড্ড হাত চলে সবার ওপর। দাঁড়া!

মাখনী পিসী নিমের কাছে বাঁকা কোমর থেকে ঘড়া নাবিয়ে, জল ভরে ফিরে আসা জলভরনিদের মাঝে বিরজুর-মা'র বেচাল কথা-বার্তার ন্যায়বিচার করাচ্ছিল—দেখলে তো বিরজুর-মাকে! যেই চারমন পাটের পয়সা হয়েছে, অমনি মাটিতে পা পড়ে না! বিচার করো তোমরা! নিজ মুখেই আট দিন আগে থেকে গাঁয়ে পাড়ায়-পাড়ায় বলে বেড়িয়েছে, হ্যাঁ, এবার বিরজুর-বাপ বলেছে, গরুরগাড়ীতে চাপিয়ে বলরামপুরের নাচ দেখিয়ে আনবো। বলদ এখন নিজের বাড়ীতে, হাজারটা গাড়ী চাইলে পাওয়া যাবে। তা, এখন আমি বলেছি, নাচ দেখার জন্য সবাই তড়িঘড়ি তৈরী হয়েছে, রান্না-বান্না করছে। আমার মুখে আগুন, কেন যে আমি বলতে গেলাম! শুনেছো, কি জবাব দিল বিরজুর-মা!

মাখনী পিসী তার ফোকলা মুখে ঠোঁট জোড়া একদিকে বেঁকিয়ে শব্দ বার করে—আ-রে-রে! বির-র্-র্-জু-উর মার···সামনে বাঁধন পে-এ-এ ছনে টান যদি না থাকে, তবে-এ-এ-ই তো!

জংগীর ছেলের-বৌ বিরজুর মাকে ভয় করে না। সে একটু গলা খুলেই বলে—পিসী-ই! সারভে সেটেলমেণ্টের হাকিমের বাসায় ফুল ছাপ পাড়ের সাড়ি পরে যদি তুইও বেগুন ভেট দিতি, তাহলে তোর নামেও দু-তিন বিঘে ধানী জমির পর্চা কাটা হতো। তাহলে, আজ তোর ঘরেও দশমন সোনাবঙ্গ পাট হতো, জোড়া বলদ কেনা যেত! তারপর সামনে বাঁধন পেছনে হাজারটা টান থাকত।

জংগীর ছেলের বৌ মুখফোঁড় মেয়ে। রেলওয়ে স্টেশনের ধারে কাছের মেয়ে। সবে তিন মাস হল গাওনায় নতুন বৌ হয়ে এসেছে,

এরি মধ্যে কুর্মা টৌলীর সব কটা ঝগড়াটে শাশুড়ীর সঙ্গে এক-আধবার ঝগড়া-বিবাদ হয়ে গেছে। ওর শ্বশুর জংগী দাগী চোর, সি-কেলাসী। ওর বর রংগী কুর্মা টৌলীর নামী লেঠেল। এই জন্য সব সময় শিং নাড়িয়ে বেড়ায় জংগীর ছেলে-বৌ।

বিরজু-র মার আঙ্গনে জংগীর ছেলের-বৌ এর গলা-খুলে কথা-গুলো রঙের বেলুনের মত শাঁ করে আসে। বিরজুর-মা একটা চোখা জবাব খুঁজে বার করে, কিন্তু মন মুষড়ে যেতে চুপ করে যায়।··· গোবরের পাহাড়ে কে আর পাথর ছোড়ে!

জিভের ঝাল গলায় নামিয়ে, বিরজুর-মা তার মেয়ে চম্পিয়াকে ডাকে—ওরে চম্পিয়া-য়া-য়া, আসুক আজ মাথা মুচড়ে চুলোয় সেঁধিয়ে দেবো! দিন-দিন বেচাল হয়ে চলেছে!···গাঁয়ে এখন থিয়েটার বায়স্কোপের গান গাওয়া ছিনাল বৌরা আসতে শুরু করেছে। নাইন্তরি মেয়ে, হয়তো কোথাও বলে 'বাজে না মুরলিয়া' শিখছে! ওরে চম্পিয়া-আ-আ-আ!

জংগীর ছেলের-বৌ বিরজুর-মার কথার স্বাদ নিয়ে কোমরে ঘড়া সানলায়, তারপর ছুলিয়ে বলে—চল্ দিদি রে চল! এই পাড়ায় হুরতনে বিবি বাস করে! জানো না বুঝি, ওপর-দিন আর চৌপহর রাত বিজলী বাতি ঝক্‌ঝক্ করে জ্বলে!

ঝক্‌ঝক্ বিজলী বাতির কথা শুনে কেন জানি সকলে খিলখিল করে হেসে ওঠে। পিসীর ফোঁকলা দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটি মিঠে গালাগাল বেরোয়—শয়তানের ঠাকুমা!

বিরজুর-মার চোখে যেন কেউ জোরালো টর্চের আলো ফেলে ধাঁধিয়ে দেয়!··ঝকঝকে বিজলী বাতি, তিন বছর আগে সার্ভে ক্যাম্পের পর গাঁয়ের জ্বলন-মুখী মেয়েরা একটা গল্প তৈরী করে ছড়িয়ে ছিল! চম্পিয়ার মার আঙ্গনে নাকি সারারাত বিজলী বাতি দপদপ করে। চম্পিয়ার মার আঙ্গনে, ছুঁচলো জুতোর ছাপ ঘোড়ার পাদানির মতো!···আরও জ্বলে-পুড়ুক! চম্পিয়ার মার আঙ্গনে

রূপোর মতো পাট শুকুতে দেখে জ্বলন-মুখী সব মেয়েরা এবার খামারে সোনালী ধানের বোঝা দেখে বেগুণ পোড়া হয়ে যাবে।

মাটির নাগড়ী থেকে চুঁইয়ে পড়া ছোয়া-গুড় আঙ্গুলে চাটতে চাটতে চম্পিয়া বাড়ী আসে। মার হাতে থাপ্পড় খেয়ে চিৎকার করে ওঠে—আমায় মারছো কেন—ও ও ও? সাহু-বৌ তাড়াতাড়ি জিনিষ দেয় না—এ্রঁ-এ্রঁ-এ্রঁ-এ্রঁ!

—আবার বাজে কথা বলছিস! বলি, ঐ এক সাহু-বৌ-এর দোকানেই মুক্তো ঝরে, যে ওখানে শেকড় গেড়ে বসেছিলি! বল, গলায় লাথি চেপে ঘাড় মটকে দেবো হতছাড়ি, আবার যদি 'বাজে না মুরলী' গাইতে শুনি।··ন্যাকামি শিখতে যাস ইষ্টিশানের ছুড়ির কাছে!

বিরজুর-মা চুপ করে নিজের গলার আওয়াজ আন্দাজ করে, তার কথাগুলো জংগীর ঝুপড়ি অব্দি পরিষ্কার পৌছে গিয়ে থাকবে।

ঘটে যাওয়ার কথা ভুলে বিরজু ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে। ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বাসন থেকে চুঁইয়ে পড়া গুড় হ্যাংলা দৃষ্টিতে দেখছিল। দিদির সঙ্গে সেও যদি ওখানে যেতো তাহলে দিদি ওকেও গুড় চাটতে দিত, নিশ্চয়; রাঙাআলুর লোভে ও এখানে পড়ে থাকে, আর চাইতে গিয়ে মা রাঙাআলুর বদলে···

—মাগো, এক আঙুল গুড় দে! বিরজু হাতের চেটো ছড়িয়ে দেয়—দেনা মা; এ-ই এক চিমটি!

—এক চিমটি কেন, নাগড়ী তুলে ফেলে আসছি পেছনের দিকে; গিয়ে চাটিস! হবে না মিষ্টি রুটি!···মিষ্টি রুটি খাওয়ার মুখ চাই!—বিরজুর মা রাঙাআলুর স্তূপ ক্রন্দনরত চম্পিয়ার সামনে রেখে বলে—বসে খোসা ছাড়া, নইলে এখন···।

দশ বছরের চম্পিয়া জানে, রাঙাআলুর খোসা ছাড়াবার সময় কম করেও বারো বার মা তার চুলে ধরে টানবে, ছোট ছোট দোষ

বার করে গালাগাল দেবে।...পা ছড়িয়ে বসে আছিস যে, বেহায়া! —চম্পিয়া মা'র রাগ ভাল করেই জানে।

বিরজু এই সুযোগে সামান্য খোসামোদ করে দেখে—মা, আমিও বসে রাঙাআলুর খোসা ছাড়াবো?

—না!—মা ঝাঁঝানি দেয়—একটা রাঙাআলু ছাড়াবে, আর তিনটে পেটে। সিধুর-বৌকে গিয়ে বল, এক ঘণ্টার জন্য কড়াই চেয়ে নিয়ে গেছে তা ফেরৎ দেয়ার নাম নেই যে! যা তাড়াতাড়ি!

মাথা ঝুঁকিয়ে আঙ্গন থেকে বেরোতে-বেরোতে বিরজু রাঙাআলু আর গুড়ের দিকে দৃষ্টি ফেলে। চম্পিয়া তার এলো চুলের ফাঁক দিয়ে মাকে দেখে, তারপর দৃষ্টি বাঁচিয়ে চুপচাপ বিরজুর দিকে একটা রাঙাআলু ছুঁড়ে দেয়।...বিরজু পালায়।

—সূর্যি ঠাকুর ডুবে গেছেন। সাঁঝ বাতির সময় হয়েছে। এখনও গাড়ী

চম্পিয়া মাঝ পথেই বলে ওঠে—কোইরীটোলায় কেউ গাড়ী দেয়নি মা! বাবা বলেছে, মা কে বলিস সব যেন ঠিক ঠিক তৈরী থাকে। মালদহিয়াটোলার মিঞাজানের গাড়ী আনতে যাচ্ছি।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে বিরজুর মার চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে পড়ে। মনে হলো, ছাতার শিক খুলে পড়েছে চরখি থেকে, হঠাৎ। কোইরী টোলার কেউ আর গাড়ী দেয়নি ধারে! আর পেয়েছে গাড়ী তাহলে! নিজের গাঁয়ের লোকেদের চোখে যখন জল নেই, তাহলে মালদহিয়া টোলার মিঞাজানের গাড়ীর ওপর কিসের ভরসা! না তিনে, না তেরোয়! কি হবে রাঙাআলুর খোসা ছাড়িয়ে! রেখে দে তুলে! ...হুঁ, ঐ মানুষটা নাচ দেখাবে! গরুর গাড়ীতে চাপিয়ে নাচ দেখাতে যাবে! হুঁ, খুব চেপেছি গরুর গাড়ীতে। খুব মন ভরে নাচ দেখেছি... পায়ে হাটা লোকেরা ততক্ষণে পৌঁছে বাসি হয়ে যাবে!

বিরজু ছোট কড়াই মাথায় উপুড় করে ফিরে আসে—ছাখ দিদি, মিলিটারী টুপি! এর ওপর দশটা লাঠি মারলেও কিছু হবে না।

চম্পিয়া চুপচাপ বসে থাকে, কিছু বলে না, সামান্য হাসেও না। বিরজু বুঝে ফেলে মার রাগ এখনও নাবে নি পুরোপুরি।

মড়াইয়ের ভেতর থেকে ছাগলকে বাইরে তাড়া করতে করতে বিরজুর-মা বিড়বিড় করে—কালকেই পাঁচকড়ি কসাইয়ের হাতে তুলে দেবো রাক্ষস কোথাকার! সব জিনিষে মুখ দেবে। চম্পিয়া, বেঁধে রাখ ছাগলকে। খুলে ফেল ওর গলার ঘন্টি। সব সময় টুং টুং! আমার একটুও ভাল লাগে না!

টুং টুং শুনতেই বিরজুর রাস্তার ধারে মসনরত গরুর গাড়ীর কথা মনে পড়ে। এখন বাবু-টোলার গাড়ী নাচ দেখতে যাচ্ছে—ঝুন্ ঝুন্ গরুর মালা, তুমি শু···

—বেশী বক্ বক্ করিস না! ছাগলের গলা থেকে মালা-ঘন্টি খুলতে খুলতে চম্পিয়া বলে।

—চম্পিয়া, উনুনে জল ঢেলে দে! বাপ এলে বলিস উড়োজাহাজে করে নিজে নাচ দেখে আসুক! আমার নাচ দেখার শখ নেই!··· আমায় কেউ জাগাবি না! আমার মাথা ধরেছে।

মড়াইয়ের উঠোনে বিরজু ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞেস করে—দিদি, নাচে উড়োজাহাজও যাবে নাকি?

কাঁথা জড়িয়ে চম্পিয়া চাটাইয়ে বসতে বসতে বিরজুকে চুপচাপ পাশে বসার ইশারা করে, মিছিমিছি মার খাবে বেচারা!

বিরজু দিদির কাঁথার ভাগ নিয়ে গুটিসুটি বসে। শীতকালে এভাবে হাঁটুতে থুতনি ঠেকিয়ে গুটিসুটি করে বসতে শিখেছে সে। চম্পিয়ার কানের কাছে মুখ এনে বলে—আমরা নাচ দেখতে যাবো না?···গাঁয়ে একটা পাখীও নেই। সবকটা চলে গেছে।

চম্পিয়ার এখন কণা-মাত্র ভরসা নেই। সাঁঝ তারা ডুবছে। বাবা এখনও গাড়ী নিয়ে ফেরেনি।···একমাস আগে থেকেই মা বলছিল, বলরামপুরে নাচের দিন মিষ্টি রুটি তৈরী হবে; চম্পিয়া ছাপা শাড়ি পরবে; বিরজু প্যাণ্ট পরবে; গরুর গাড়ীতে চেপে···

চম্পিয়ার ভেজা পলকে এক ফোঁটা অশ্রু এসে থামে।

বিরজুর বুকও ভারি হয়ে পড়ে। সে মনে-মনে তেঁতুল গাছের জিনবাবাকে একটা বেগুন দেয়ার মানত করে, গাছের প্রথম বেগুন, সে নিজে যেই গাছের চারা পুতেছে!...তাড়াতাড়ি গাড়ী নিয়ে বাবাকে পাঠিয়ে দাও, জিন বাবা!

মড়াইয়ের ভেতরে বিরজুর মা চাটাইয়ে শুয়ে পাশ ফিরছিল। উহু, আগে থেকে কোন কিছুর সাধ করা উচিত নয়! ভগবান তার ভেঙ্গে ফেলেছে। সবচেয়ে আগে ভগবানকেই তার জিজ্ঞেস করতে হবে, কোন ভুলের জন্য এমন ফল দিচ্ছ ভোলাবাবা। আপন জ্ঞানে সে কোন ঠাকুর-দেবতার মানত অপূর্ণ রাখেনি। সার্ভের সময় জমির জন্য যত মানত করেছিল ··ওমা, ঠিক তো! মহাবীরজীর রুটি এখনও বাকী আছে। হায়, হায় ঠাকুর!···ভুল-ক্রটি ক্ষমা করো মহাবীর বাবা! মানত দ্বিগুণ করে দেবে বিরজুর মা!···

বিরজুর-মার মনে থেকে থেকে জংগীর ছেলের বৌয়ের কথা বিঁধতে থাকে, ঝক্ ঝক্ বিজলী বাতি!··চুরি-চামারি করা লোকেদের ঝি-বৌ জ্বলবেই তো! পাঁচ বিঘে জমি আদায় করেছে বিরজুর বাবা, ওমনি গাঁয়ের ভাই-খেকোর চোখে যেন কুটো পড়েছে। মাঠে ক্ষেতে পাটের চাষ দেখে গাঁয়ের লোকেদের বুক ফাটতে শুরু করেছে; মাটি ফেটে পাট উপচে পড়েছে; বৈশাখী মেঘের মত ফুলে-কেঁপে উঠছে পাটের ফসল! এ মাথা ও মাথা! এত চোখের নজর কি আর ফসল সইতে পারে! যেখানে পনরো মন পাট হওয়ার কথা, মাত্র দশ মন পাট দাঁড়িপাল্লায় ওজন উঠেছে রবি ভগতের গুদামে।···

এতে জ্বলার কি আছে বাপু!···বিরজুর বাবা প্রথমেই কুর্মী-টোলার এক-একজনকে বুঝিয়ে বলেছে—সারাজীবন কি জন-মজুরী করেই কাটবে! সার্ভের সময় এসেছে, লাঠি শক্ত করে ধরলে দু-চার বিঘে জমি আদায় হতে পারে। —তা, গাঁয়ের কোনো পুতখেকোর ভাতার সার্ভের সময় জমিদারবাবুর বিরুদ্ধে কাশলো না পর্যন্ত।···

বিরজুর বাবাকে কি কম সইতে হয়েছে! জমিদারবাবু রাগে-ক্রোধে সার্কাসের বাঘের মত লম্ফঝম্ফ করতে থাকে। ওর বড় ছেলে বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেবে বলে শাসিয়ে গেছিল।···শেষে জোতদারবাবু তাঁর ছোট ছেলেকে পাঠায়। বিরজুর মাকে 'মাসী' বলে ডাকে—এই জমিটা বাবা আমার নামে কিনেছিল। আমার লেখাপড়ার খরচ এই জমির ফসলেই চলে।—আরও কত কথা! কি মোহন যাদুই না জানে ঐটুকুন ছেলে। জমিদারের বেটা তো···

—চম্পিয়া, বিরজু ঘুমিয়ে পড়েছে নাকি? এখানে চলে আয় বিরজু, ভেতরে। তুইও চলে আয়, চম্পিয়া।···বাড়ীর কত্তা আসুক আজ।

বিরজুর সঙ্গে চম্পিয়া ভেতরে উঠে আসে।

—কুপি নিবিয়ে দে।···বাবা ডাকলে জবাব দিবি না। ঝাঁপ ফেলে দে।

ভালো মানুষ রে, ভালো মানুষ। মুখ দেখো না এই পুরুষ মানুষের!···বিরজুর মা যদি রাত-দিন মুখ না করতো, তাহলে আর পেয়েছিল এই জমি! রোজ ফিরে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ত—আমার জমি চাই না বিরজুর-মা, মজুরীই ভালো।—বিরজুর-মা খুব ভেবেচিন্তে জবাব দিত—বাদ দাও তাহলে, তোমার যখন মনই স্থির হয় না, তাহলে আর কি হবে! বউ-জমি হল জোরের, নইলে আর কারোর!···

বিরজুর বাপের ওপর বেজায় রাগ জমেছে। আরও জমে উঠছে।·· বিরজুর মার ভাগ্যই খারাপ—এমন গোবর-গণেশ মার্কা কর্তা পেয়েছে। কিই বা সখ-আহ্লাদ পূরণ করেছে ঐ পুরুষ মানুষ! কলুর বলদের মত খেটে সারা বয়স কাটিয়ে দিল তাঁর কাছে, কখনও এক পয়সার জিলিপীও কি এনে দিয়েছে তার মরদ!·· পাটের দাম ভগতের কাছ থেকে নিয়ে বাইরে বাইরেই বলদ-হাটায় চলে গেছে। বিরজুর-মাকে একবারও নম্বরী নোটখানি চোখের

দেখা দেখিয়ে নিয়ে গেল না।…বলদ কিনে আনল। সেদিন থেকেই গাঁয়ে ঢ্যাড়া পিটাতে শুরু করেছে—বিরজুর-মা এবার গরুর গাড়ীতে চেপে নাচ দেখতে যাবে।…অপরের গাড়ীর ভরসায় নাচ দেখাবে!…

শেষে নিজের ওপরেই তার রাগ ধরে। সে নিজেও কম নয়। তার জিভে আগুন লাগুক! গরুর গাড়ী চেপে নাচ দেখার লালসা কোন কুক্ষণে তার মুখ থেকে বেরিয়েছে, ভগবান জানেন! তারপর, আজ সকাল থেকে দুপুর অব্দি, কোন না কোন অজুহাতে সে আঠারোবার গরুর গাড়ী চেপে নাচ দেখতে যাবার কথা তুলেছে।… হুঁ, খুব নাচ দেখ! বাহ্‌রে নাচ! কাঁথার তলায় শুয়ে শাল-আলোয়ানের স্বপ্ন! কাল সকালে জল ভরার জন্য যখন যাবে, ছুঁচলো জিভের ছুঁড়িরা হাসাহাসি করে যাবে, আসবে।… সকলেই হিংসে করে তাকে; হ্যাঁ, ভগবানও একচোখা! দুই সন্তানের মা হয়েও যেমন-কে-তেমন আছে। তার বাড়ীর কর্তাও তার কথায় চলে। সে চুলে নারকেল তেল মাখে। তার নিজের জমি আছে। আছে কারো কাছে এক কাচ্চাও জমি এই গাঁয়ে? হিংসা করবে না! তিন বিঘেয় ধান হয়েছে, অঘ্রানী। লোকদের নজর-দৃষ্টি থেকে যদি বাঁচে, তবেই তো!

বাইরে বলদের ঘন্টি শোনা যায়। তিনজনেই সতর্ক হয়ে পড়ে। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে।

—আমাদের বলদের ঘন্টি না রে চম্পিয়া?

চম্পিয়া ও বিরজু প্রায় একযোগে বলে ওঠে—হ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ!

—চুপ! —বিরজুর মা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে—গাড়ীও আছে সঙ্গে। ঘর্ঘর করছে, তাই না?

—হ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ! —দুজনে আবার সম্মতি জানায়।

—চুপ! গাড়ী নেই। তুই চুপচাপ বেড়া ফাঁক করে দেখে আয় তো চম্পী! পালিয়ে আয়, চুপচাপ।

চম্পিয়া বেড়ালের মত পা টিপে-টিপে বেড়ার কাঁকে উঁকি মেরে দেখে আসে—হ্যাঁ মা, গাড়ীও রয়েছে!

বিরজু ধড়ফড় করে উঠে বসে। ওর মা ওর হাত ধরে শুইয়ে দেয়—কথা বলিস না।

চম্পিয়াও কাঁথার তলায় ঢুকে পড়ে।

বাইরে গরুর গাড়ীর দড়ি খোলার শব্দ ভেসে আসে। বিরজুর বাবা বলদ দুটোকে শক্ত গলায় ধমক দেয়—হ্যাঁ-হ্যাঁ! বাড়ী এসে গেছি! বাড়ী ফেরার জন্য বড় বুক ফেটে যাচ্ছিল!

বিরজুর মা চটে ওঠে, নিশ্চয় মালদহিয়া টোলায় গাঁজা টেনে এসেছে, গলার আওয়াজ খনখনে বেরোচ্ছে।

—চম্পিয়া-আ! —বাইরে থেকেই তার বাবা ডেকে বলে বলদ দুটোকে ঘাস দে, চম্পিয়া-আ!

ভেতর থেকে কোন জবাব আসে না। চম্পিয়ার বাবা আঙ্গনে এসে দেখে—না আলো, না পিদিম, না উনুনে আগুন। ···ব্যাপার কি! নাচ দেখার জন্য উতলা হয়ে, হাঁটা পায়ে রওনা দিয়েছে নাকি···!

বিরজুর গলা খুসখুস করে ওঠে, তা আটকাবার জন্য খুব চেষ্টাও করে। কিন্তু কাশি শুরু হতে নাগাড়ে পাঁচ মিনিট ধরে কাশতে থাকে।

—বিরজু! বাবা বিরজ মোহন! —বিরজুর বাবা আদর করে ডাকে—মা রাগ করে শুয়ে আছে বুঝি? দেখে যা, এখনও লোকেরা যাচ্ছে।

বিরজুর-মা'র ইচ্ছে হয় শক্ত একটা জবাব দেয়, আর দেখতে হবে না নাচ! ফিরিয়ে দাও গাড়ী!

—চম্পিয়া-আ! উঠছিস না কেন? নে, ধানের পঞ্চ শিষ রেখে দে। ধান ছড়ার—ছোট আঁটি ঝোপড়ির দাওয়ায় রেখে সে বলে—বাতি ধরা!

বিরজুর মা উঠে দাওয়ায় আসে—দেড় পহর রাতে গাড়ী আনার দরকার কি ছিল? নাচ প্রায় শেষ হয়ে এল।

কুপির আলোয় ধান ছড়ার রঙ দেখার সঙ্গে সঙ্গে বিরজুর মা'র মনের সমস্ত ময়লা দূর হয়ে যায়।…ধানী রঙ তার চোখ থেকে নেমে শিরা-উপশিরায় মিশে যায়।

—নাচ এখনও শুরু হয়নি। এই মাত্র বলরামপুর বাবুদের কোম্পানীগাড়ী মোহনপুর হোটেল বাংলো থেকে হাকিম সাহেব কে আনতে গেছে। এ বছরে এটাই শেষ নাচ।…পঞ্চ শিষ বেড়ার বাতায় গুজে রাখো, আমাদের ক্ষেতের ধান।

—আমাদের ক্ষেতের?—উৎসাহ গলায় বিরজুর-মা জিজ্ঞেস করে-—ধান পেকে গেছে?

—না, দশদিনে অগ্রাণ পেরোতে-না-পেরোতে লাল হয়ে ঝুঁকে পড়বে সারা ক্ষেতের ছড়া।… মালদহিয়া টোলা যাচ্ছিলাম, আমাদের ক্ষেতের ধান দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। সত্যি বলছি, ধানের পঞ্চ শিষ ছেঁড়ার সময় আঙুল কাঁপছিল আমার!

বিরজু ধান-ছড়া থেকে একটা ধান বার করে মুখে ফেলে, তার মা হাল্কা ধমক দেয়—কেমন হাঁদারে তুই!…এই সব শত্তুরের জ্বালায় কোন ধর্ম-পুন্যি করার জো নেই।

—কি হলো, বকছো কেন?

—নবান্নর আগেই নতুন ধান এঁটো করল, দেখছ না?

—এদের বেলায় সব কিছু মাফ। এরা বলতে গেলে পাখ-পাখালী। এদের মুখে নবান্নের আগেই। নতুন অন্ন পড়ে না।

এরপর চম্পিয়াও ধান ছড়া থেকে দুটো ধান নিয়ে দাঁতে চিবোয়—সত্যি মা! কি মিষ্টি চাল!

—কেমন সুন্দর গন্ধ তাই না দিদি?—বিরজু আবার মুখে ধান চিবোয়।

—রুটি-টুটি করে রেখেছো নাকি?—বিরজুর বাবা হেসে জিজ্ঞেস করে।

—না!—অভিমানী স্বরে বিরজুর মা বলে—খাবার ঠিক-ঠিকানা নেই···ওদিকে রুটি করতে বসি!

বাহ! তোমরাও বেশ আছো!···যার কাছে বলদ আছে, সে কি চাইলে গাড়ী পাবে না? গাড়ীঅলাদেরও যে মাঝে-সাঝে বলদের দরকার পড়ে।···জিজ্ঞেস করবো তাহলে কোয়রী টোলাদের!···যা; তাড়াতাড়ি রুটি করে নে।

—দেরী হবে না!

—চাকি ভর্তি রুটি তুইত চোখের নিমেষেই করে ফেলিস; পাঁচ-টা রুটি করতে কত আর দেরী হবে!

এখন বিরজুর-মা'র ঠোঁটে হাসি ছড়িয়ে পড়তে থাকে। সে চোখ বাঁচিয়ে দেখে, বিরজুর বাবা একদৃষ্টে তাকে দেখছে।···চম্পিয়া আর বিরজু না থাকলে মনের কথা হেসে খুলে বলতে আটকাতো না। চম্পিয়া আর বিরজু একে অপরকে দেখে, আনন্দে খুশীতে ওদের চেহারা ঝলমল করে ওঠে—মা মিছিমিছি রাগ করছিল!

—চম্পী! যাতো চাতালে দাঁড়িয়ে মাখনী পিসীকে একবার ডাক।

—ও পিসী-ই-ই! শুনছো পিসী-ই! মা ডাকছে!

পিসী কোন জবাব সরাসরি দেয় না, কিন্তু তার বিড়বিড় শব্দ স্পষ্ট শোনা যায়—হ্যাঁ! এখন পিসীকে অত সাধছো কেন? সারা গাঁয়ে শুধু এক পিসীই রয়েছে যার কোন টান-বাধন নেই।

—ওগো পিসী!—বিরজুর মা হেসে জবাব দেয়—তখন খুব রাগ করেছিলে তাই না? বাঁধন-টান অলাদের এসে দেখো, দুপহর রাতে গাড়ী নিয়ে এসেছে! তাড়াতাড়ি এসো পিসী, আমি মিষ্টি রুটি করতে পারি না।

পিসী কাঁশতে কাঁশতে আসে—এই জন্যই তো ঘড়ি পহর দিন থাকতেই জিজ্ঞেস করেছিলাম নাচ দেখতে যাবে না? তখন বললে, আমি আগে থাকতেই আমার আঙটা—এখানে ধরিয়ে যেতাম।

বিরজুর মা পিসীকে আঙটা দেখিয়ে দেয়, বলে—ঘরে ফসল-টসল কিছুই নেই। শুধু এক ছাগল আর কয়েকটা বাসন-কোষন। তা সারা রাতের জন্য এখানে তামাক রেখে যাচ্ছি। তোমার হুঁকো এনেছো তো পিসী ?

পিসী যদি তামাক পায়, সারা রাত কেন, পাঁচ রাত বসে জাগতে পারে। পিসী অন্ধকারে হাতড়ে তামাকের আন্দাজ করে। ও-হো! এযে দরাজ হাতে তামাক রেখেছে বিরজুর-মা! আর ঐ এক সাহু-বৌ! রাম বলো! সেবারে আফিমের গুলীর মত মটর-ওজনে তামাক রেখে গেছিল গোলাপ বাগ মেলায়, আর বলে গেল ডিবে-ভর্তি তামাক আছে।

বিরজুর-মা উনুন ধরায়। চম্পিয়া রাঙাআলু মেখে-মেখে দলা পাকায় আর বিরজু মাথায় কড়াই উল্টে রেখে বাবাকে দেখায়—মিলিটারী টুপি! এর ওপর দশ লাঠি মারলেও কিছু হবে না।

সকলেই সশব্দে হেসে ওঠে। বিরজুর মা হেসে বলে—তাকের ওপর তিন-চারটে মোটা রাঙাআলু আছে, চম্পিয়া দিয়ে দে বিরজুকে, বেচারা সন্ধ্যে থেকে

—বেচারা বলো না মা, খুব চালু ছেলে!—এখন চম্পিয়া কিচমিচ করে—তুমি জানো ন, কাঁথার তলায় মুখ চলছিল কেন বাবু সাহেবের!

—হি-হি-হি!

বিরজুর ভাঙ্গা দুধ-দাঁতের ফাঁক দিয়ে কথা বেরোয়—বেলাক-মারটিনে পাঁচটা রাঙা আলু খেয়ে ফেলেছি! হা-হা-হা!

সকলেই আবার সশব্দে হেসে ওঠে। বিরজুর মা পিসীর মন-রাখার জন্য জিজ্ঞেস করে—এক ছটাক গুড় আছে। আদ্ধেক দেবো নাকি পিসী ?

পিসী গদ্গদ্ হয়ে বলে—রাঙা আলু তো এমনি মিঠে, অত দেবে কেন ?

যতক্ষণ ধরে বলদ-জোড়া ঘাস-দানা খেয়ে একে-অপরের দেহ জিভ দিয়ে চাটে, বিরজুর মা তৈরী হয়ে পড়ে। চম্পিয়া ছাপা সাড়ি পরে আর বিরজু বোতামের অভাবে প্যান্টে পাটের দড়ি বাঁধে।

বিরজুর মা আঙ্গন থেকে বেরিয়ে গাঁয়ের দিকে উৎকর্ণ হয়ে শোনার চেষ্টা করে—উহুঁ, হেঁটে যাওয়ার লোক কি আর এতক্ষণ থাকে!

পূর্ণিমার চাঁদ মাথার উপর এসে পড়েছে।···বিরজুর মা আসলি রুপোর টিকলি পরেছে আজ প্রথম। বিরজুর বাবার কি হলো, গাড়ী জুতছে না কেন, মুখের দিকে হা করে এক দৃষ্টে চেয়ে দেখছে, যেন নাচের হরতনের

গাড়ীতে বসতেই বিরজুর মার শরীরে এক বিচিত্র সুড়সুড়ি হতে থাকে। সে বাঁশের বল্লী ধরে বলে—গাড়ীতে এখনও অনেক জায়গা আছে।···একটু ডান রাস্তা ধরে গাড়ী হেঁকো।

বলদ জোড়া দৌড়াতে শুরু করলে, চাকা চিঁই-চিঁই শব্দে ঘর্ঘর করতে শুরু করে, বিরজুর পক্ষে আর চুপ করে থাকা সম্ভব হয় না —উড়োজাহাজের মত ওড়াও বাবা!

গাড়ী জংগীর বাসার পেছন দিকে পৌঁছয়। বিরজুর মা বলে— জংগীকে একটু জিজ্ঞেস করোত, ওর ছেলের-বৌ নাচ দেখতে চলে গেছে কিনা?

গাড়ী থামতেই জংগীর ঝুপড়ি থেকে ভেসে আসা কান্নার শব্দ স্পষ্ট হয়ে পড়ে। বিরজুর বাবা জিজ্ঞেস করে—ও জংগী ভাই, কান্না-কাটি হচ্ছে কেন ভেতরে?

জংগী আগুন পোহাচ্ছিল, বলে—আর জিজ্ঞেস করো কেন, রংগী বলরামপুর থেকে ফিরে আসেনি, বৌমা নাচ দেখতে যাবে কি করে? পথ চেয়ে দেখতে দেখতে ওদিকে গাঁয়ের সব বৌ-ঝিরা চলে গেছে।

—ওগো স্টেশনওয়ালী তা কাঁদছো কেন?—বিরজুর মা ডেকে

বলে—তাড়াতাড়ি চলে আয় সাড়ি পালটে! গোটা গাড়ী ফাঁকা পড়ে আছে! বেচারী!…তাড়াতাড়ি আয়!

পাশের ঝুপড়ী থেকে রাধার মেয়ে সুন্দরী বলে ওঠে—কাকা, গাড়ীতে জায়গা আছে? আমিও যাবো।

বাঁশ-ঝাড়ের ওপারে নারান খাবাসের ঘর। তার বৌও থাকতে পারে না। গিলটি করা ঝুমকো-হার পরে ঝম্‌ঝম্ শব্দ তুলে আসে।

—চলে আয়। যারা রয়ে গেছে, সবাই তাড়াতাড়ি চলে আসুক!

জংগীর ছেলে-বৌ, নারানের বৌ আর রাধার মেয়ে সুন্দরী, তিনজনেই গাড়ীর কাছে এগিয়ে আসে। বলদটা পেছন দিকে পা চালায়। বিরজুর বাবা একটা বাজে গাল দেয়—শালা! লাথি ছুঁড়ে খোঁড়া করবি নাকি বৌ-দের!

সকলেই সশব্দে হেসে ওঠে। বিরজুর বাবা ঘোমটা ঢাকা আনত তুই বৌকে দেখে। তার নিজের মাঠের আনত ধান ছড়ার কথা মনে পড়ে!

জংগীর ছেলের-বৌ'র গাওনা তিনমাস আগে হয়েছে। গাওনার রঙীন সাড়ী থেকে তেল আর মেটে-সিঁদুরের গন্ধ আসছে। বিরজুর মা'র নিজের গাওনার কথা মনে পড়ে। সে কাপড়ের পুটলি থেকে তিনটে মিষ্টি রুটি বার করে বলে—খেয়ে ফেল একটা একটা করে। সিমরাহায় সরকারী কুঁয়ো থেকে জল খেয়ে নিস।

গাড়ী গাঁয়ের বাইরে এলে ধান ক্ষেতের পাশ দিয়ে যেতে থাকে। জ্যোৎস্না, কার্তিক মাসের!…ক্ষেত থেকে ধানের ঝরা ফুলের গন্ধ আসে। বাঁশ ঝাড়ে কোথাও বুনো লতা ফুটে আছে। জংগীর ছেলের-বৌ একটা বিড়ি ধরিয়ে বিরজুর-মার দিকে এগিয়ে দেয়। বিরজুর-মার সহসা মনে পড়ে, চম্পিয়া, সুনরী, লরেনার বৌ আর জংগীর ছেলের-বৌ,—এরা চার জনেই গাঁয়ে বায়স্কোপের গান গাইতে জানে।…খুব!

গাড়ীর চাকা ধান ক্ষেতের মাঝ বরাবর গেছে। চারদিকে গাওনার সাড়ির খসখস ধরণের শব্দ।··বিরজুর মার মাথায় টিপে চল্‌কে পড়ছে জ্যোৎস্না।

—আচ্ছা, এখন একটা বায়স্কোপের গান গা তো চম্পিয়া।··· ভয় কিসের? ভুল করলে, পাশেই মাস্টারনী বসে আছে!

বৌ তুজনত নয়ই, কিন্তু চম্পিয়া ও সুনরী কেশে গলা পরিষ্কার করে।

বিরজুর বাবা বলদ তুটোকে হাঁক দেয়—চল ভাই! আরও জোরে জোরে! গা-না চম্পিয়া. নইলে আমি বলদ তুটোকে আস্তে আস্তে যেতে বলবো।

জংগীর ছেলের-বৌ চম্পিয়ার কানের কাছে ঘোমটা নিয়ে কিছু একটা বলে। তারপর, চম্পিয়া চাপা সুরে শুরু করে—চাঁদের জোছনা

বিরজুকে কোলে করে বসা মায়ের ইচ্ছে হয়, সেও সঙ্গে-সঙ্গে গান গায়। বিরজুর-মা জংগীর ছেলের-বৌ'র দিকে চায়, সেও গুণগুণ করছে। কি ভালো বৌ! গাওনার সাড়ি থেকে এক বিশেষ ধরনের গন্ধ বেরোয়। ঠিকই বলেছে সে! বিরজুর-মা বিবি বটে, হরতনের বিবি! এ তো কোন খারাপ কথা নয়। হ্যাঁ, সে সত্যি হরতনের বিবি!

বিরজুর-মা নিজের নাকের ডগায় তুই চোখ কেন্দ্রিত করার চেষ্টা করে আপন রূপের ঝলক নেয়, লাল সাড়ির ঝলমলে পাড়, সিঁথি-টিপে চাঁদ।··বিবজুর-মার মনে এখন আর কোন লালসা নেই। তার ঘুম পাচ্ছে।



ফাতিমাদিকে কখনও দেখবো, আর এ রকম দেখবো—এ আমি কল্পনাও করিনি। তাই কিছুক্ষণ পাটনা মার্কেটকে স্বপ্নলোক ভেবে উদাস-উদাস দাঁড়িয়ে থাকি—জুতোর দোকানে। বোরখায় আপাদ-মস্তক ঢাকা দুজন মহিলা এবং সঙ্গে ন-দশ বছরের পুতুল প্রতিম সুন্দর মেয়ে। মেয়েটি দ্বিতীয়বার বলে—'মাসী জিজ্ঞেস করছেন পাটনায় আপনি কবে এসেছেন?'

দোকানদার খুচরো পয়সা গুণতে-গুণতে বলে, 'ও আপনাকেই জিজ্ঞেস করছেন!'

মেয়েটি হেসে ফেলে। বোরখার ভেতর থেকেও হাসি উপচে পড়ে।...পরিচিত হাসি! মেয়েটি হাসে তার মাসীর কোন কথা শুনে; বলে, 'আমার মাসী হলো আপনার ফাতিমাদি।'

এরপর খয়েরী রঙের বোরখার ভেতর থেকে ফাতিমাদির চির-পরিচিত স্বর স্পষ্ট শোনা যায়—'শোনো, কোথায় থাকো এখন, দিল্লী নাকি বোম্বে?'

'গত দশ বছর ধরে আমি পাটনায় আছি।'

'আশ্চর্য! পাটনায় থাকো, অথচ কখনও দেখিনি?'

'আপনি···?' এতক্ষণ পরে যেন আমার হুঁশ ফিরে আসে।

আমার কথা মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বোরখা-ঢাকা ফাতিমাদি বললেন, 'আমার কথা বাদ দাও। তোমার কথা বল। বিয়ে-থা করেছো?'

আমায় অপ্রতিভ দেখে বলে ওঠেন, 'বাখরগঞ্জ গলিতে দীনেশ

মঞ্জিল দেখেছো ত? সেখানেই থাকি। বৌকে নিয়ে কবে আসছো? কালকেই এসো না, সকাল আটটায়।...'

মেয়েটি বলে, 'কাল সকাল আটটায় যে হামিদাখালার বাড়ী যাবার কথা।'

'ও-হ্যাঁ...পরশু এসো!'

আমার মুখ থেকে অনায়াসে বেরিয়ে পড়ে, 'প্রণাম!'

'ভালো থেকো।'

ফাতিমাদিকে কখনও আদাব-অর্জ বলিনি আমি। তিনি আমার 'প্রণাম' কবুল করে সর্বদা 'ভালো থেকো' বলেই আশীর্বাদ করেছেন। কিন্তু ফাতিমা-দিকে এইভাবে আপাদমস্তক ঢাকা অবস্থায় কখনও দেখিনি। সেইসব দিনেও নয়, যখন তিনি পরিচিতদের দৃষ্টি থেকে আড়ালে থাকতেন।

সারারাত ঘুম আসে না। চোখ বন্ধ করলেই খয়েরী রঙের বোরখা-ঢাকা ছায়া এসে দাঁড়িয়ে পড়ে।...একজোড়া জালিদার চোখ। শত চেষ্টা সত্ত্বেও বোরখা সরিয়ে ফাতিমাদির চেহারা দেখতে পারি না...এবং বিরক্ত হয়ে চোখ খুলে ফেলি।

কর্তার দীর্ঘশ্বাস এবং ছটফটানি দেখে-শুনে যে-কোন গৃহিনী শঙ্কিত হতে পারেন। কিন্তু গল্প লেখকের স্ত্রী জানে, গল্পের প্লট ভাবার সময় তার গৃহকর্তা এইরকম অর্থহীন, সামঞ্জস্যহীন, অস্থির হয়ে দীর্ঘশ্বাস বুকে নিয়ে পাশ ফিরতে থাকে। তাই সে নিরুদ্বেগে ঘুমিয়ে কাটায়।

রাত্রে সে জেগেই ছিল। জিজ্ঞেস করি, 'তোমাকে কি কখনও আমি ফাতিমাদির কথা বলেছি?'

'না তো। কে ফাতিমাদি?'

'একটি গল্পের চরিত্র ফাতিমাদি।' কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে আমি পাশ ফিরে শুই।

গল্পের চরিত্র ফাতিমাদি! আশ্চর্য হই এই ভেবে যে ফাতিমাদি

সম্পর্কে অদ্যাবধি আমার স্ত্রীকে কিছুই শোনাইনি।… না, আশ্চার্যের ব্যাপার নয়। গোঁড়া সনাতনপন্থীর মেয়ে এবং হিন্দুসভাইস্ট ভাইয়ের বোনকে জেনেশুনেই আমি কখনও ফাতিমাদির কোন কথা বলিনি। ভয় ছিল, শুনেই মুখ বেঁকিয়ে কিছু বলে বসবে। বলবে- অ্যাবসার্ড!

অ্যাবসার্ড নয়, অসাধারণ!

আজ থেকে ছত্রিশ বছর পূর্বেও লোকেরা বলেছিল—অ্যাবনরমাল! …আধপাগলী।

আমার সৌভাগ্য যে আমি এই অসাধারণ মহিলাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি।

…মনে পড়ে ১৯৩০এর সেই সভা। স্কুলের পেছন দিকে সাংঘাতিক ভিড়। ঠাকুরদালানের চত্বরে গান্ধীটুপি পরা কয়েকজন বসেছিলেন। একটি দশ-এগারো বছরের মেয়ে 'লেকচার' দিচ্ছিল। মেয়েটিকে পাজামা-কুর্তা পরতে দেখে বিস্মিত হই। শুনি, শোণপুরের মৌলবী সাহেবের বেটি। মৌলভী সাহেব খিলাফৎ আন্দোলনের সময় থেকে খদ্দর পরতেন, চরখা কাটতেন। সাদা পাজামা-কুর্তা পরনে, কাঁধে তেরঙ্গা ঝাণ্ডা নিয়ে দাঁড়িয়ে মেয়েটি।

…১৯৩২এ প্রলয়ঙ্করী ভূমিকম্পের পর দ্বিতীয়বার দেখেছিলাম। চার বছরেই বেশ বড় হয়ে উঠেছিল। মহাত্মাগান্ধী ভূমিকম্পপীড়িত ক্ষেত্র পরিদর্শন করতে এসেছিলেন। মঞ্চে গান্ধীজীর পাশে দাঁড়ানো মেয়েটিকে চিনতে কোন অসুবিধে হয়নি।…প্রার্থনা সভায় কোরাণ শরীফ সুললিত স্বরে পাঠরত মৌলবী সাহেবের বেটি। হালে দুবছরের সাজা কাটিয়ে জেল থেকে বেরিয়েছে। শোনা যায়, গ্রেপ্তারের সময় পুলিশের লাঠিতে সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিল।

…১৯৩৭এ তৃতীয়বার। সেবারই কাছ থেকে দেখার প্রথম সুযোগ পাই। স্কুলের মাঠে জেলা রাজনৈতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। কংগ্রেসী মিনিষ্টারের আমল। স্কুলেই প্রতিনিধিদের

থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং স্কুলের স্কাউট দল কংগ্রেস সেবাদলের স্বেচ্ছা-সেবকের সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করছিল। সেবাদলের জি. ও. সি. মৌলবী সাহেবের বেটিকে প্রথমবার 'ফাতিমাদি' বলে ডেকেছিলাম। ঐ সভায় প্রফেসার অজীমাবাদীর বক্তৃতার সময় মুসলিম লীগিরা ঝামেলা বাঁধাবার চেষ্টা করে। ফতিমাদি তরতর করে মঞ্চে উঠে গিয়েছিলেন। তার দৃঢ় আওয়াজ প্যাণ্ডেলে ছড়িয়ে পড়েছিল—'গদ্দারো! শরম করো!'

…এবং, ১৯৪৩-এ পাঁচ মাস কাল দিবারাত্রি তাঁর সঙ্গে থাকতে হয়েছিল। বেনারস, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ এবং গোরখপুরের গলিতে 'আজাদ দস্তার' বিপ্লবাত্মক কার্যক্রম নিয়ে সাড়া তোলা ফাতিমাদির ছবি চোখের সামনে হাজির হয়, এক-এক করে।…গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ সার্জেন্টের বিশ্রী গালাগালের জবাব দেয়ার সময় তাঁর চোখে-মুখে যে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে পড়েছিল, ১৯৪৭এ হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময় প্রতিরোধের সময় তাঁর মুখমণ্ডলে যে আভা ছেয়ে থাকতো,— সবকিছু এই খয়েরী বোরখায় জানি না কিভাবে ঢেকে ফেলেছেন? কি করে হলো?

…আমি তাঁর মুখে ঢাকা পর্দা কুটি কুটি করে উড়িয়ে দিতে চাই, আমি ফতিমাদির মুখ দেখতে চাই, এবং তিনি আর্ত-চিৎকারে দুহাতে মুখখানা ঢেকে ফেলেন—'না-না! অজু!…অজীজ!…আমার মুখ দেখো না…'

স্বপ্ন ভাঙ্গার পর আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ পড়ে থাকি। অল ইণ্ডিয়া রেডিয়োর 'সিগনেচার টিউন' শুরু হয়েছে। সহসা, মনে একটা ভাবনা উদয় হয়—আকাশবানীর 'সিগনেচার টিউন' পরিবর্তনের জন্য অদ্যাবধি কোন 'হাঙ্গামা' হয়নি কেন? এ যে 'আজানের সুর।…ভায়লিনের ওপর কাঁপা-কাঁপা নমাজের আহ্বান।

দানিশমঞ্জিলের সিঁড়িতে ওঠার সময় মনে হয়, এই প্রাচীন ইমারতের প্রতিটি ইঁট আমায় আশ্চর্য চোখে দেখছে।

'কার সঙ্গে দেখা করতে চান ?'

'ফাতিমাদির সঙ্গে।'

'কার সঙ্গে ?'

প্রশ্নকারী বিস্ময়ের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর বিড়বিড় করে—'ফাতিমাদি ?...'

পুতুল-প্রতিম সুন্দর মেয়েটি হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে, সেলাম করে বলে, 'মাসী জানতে চাইছে বৌকে কেন সঙ্গে নিয়ে আসেন নি ?'

আমি বুঝে ফেলি, ফতিমাদি আজ আমার সম্মুখে আসবেন না। আজও এই মেয়েটিকে মাঝখানে রেখে কথা চালাবেন।

ওদিকটায় কয়েকটা ঘরের দরজা জোরে-জোরে বন্ধ হয়ে পড়ে। মৃদু শব্দে ঝংকৃত রেডিয়ো সহসা চুপ হয়ে পড়ে। বাতাসে ফিসফিসানি এবং রহস্যময়তা।

'শুনেছি অফসানা (গল্প) লেখো ?' চিকের আড়াল থেকে প্রশ্ন বেরিয়ে আসে।

মেজেতে বিছানো ছেঁড়া সতরঞ্চির দিকে তাকিয়ে আমি জবাব দিই—'হ্যাঁ, মিথ্যে বলার অভ্যাস এখন পেশা।'

খিলখিল শব্দ শুনে দানিশ মঞ্জিলের কয়েকটি জানালা খুলে যায়। ভাজা পেঁয়াজের গন্ধে কামরা ভারি হয়ে পড়ে। এবং এই গন্ধই আমার মগজে সম্প্রতি একটা ঘটনার কথা মনে করিয়ে দেয়।...এন. সি. সি. ক্যাম্পের বাবুর্চিখানায় 'বিষ-মৃত্যু'র শিশির সঙ্গে ধরা পড়া সেই মুসলমান যুবকটির নাম কি ছিল ?

পুতুল-প্রতিম মেয়েটির নাম নগমা। সে একপেয়ালা চা নিয়ে আসে। আমি মিথ্যে বলতে চাইছিলাম, কিন্তু বলতে পারি না। চায়ের পেয়ালা হাতে নিয়ে আমি জিজ্ঞেস করি—'তো, ফাতিমাদি... আপনি এতদিন ধরে মানে আপনি...আপনি যেন কোথায় হারিয়ে গেছেন ?'

জবাব আসে, 'বৌকে নিয়ে কবে আসছো ?'

—আমি চোখ বন্ধ করে চা খেয়ে ফেলি। বুঝে ফেলি, ফাতিমাদি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে চান না। আমার এখন সন্দেহ হতে থাকে, এই খাতুন আমাদের ফাতিমাদি নন—অন্য কেউ।

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াই। নগ্‌মা পান নিয়ে আসে। এবার পরিষ্কার মিথ্যে বলি, 'আমি পান খাই না।'

যাবার সময় আমি সাহসে ভর করে বলেই ফেলি, 'মাফ করবেন। আমার মনে হয় আপনি আমাদের সেই ফাতিমাদি নন··· ।'

'তুমি ঠিক ধরেছো, অজীজ !'

অজীজ ? আমি এবার চমকে উঠি। মনে পড়ে, ফাতিমাদি আমায় অজিত নয়, অজীজ বলতেন। আমি নিরুত্তর দাঁড়িয়ে থাকি, চিকের ওপারে আবার উন্মুক্ত খিলখিল হাসি বেজে ওঠে।

দানিশ-মঞ্জিল-এর সিঁড়ি বেয়ে নাববার সময় আমার মনে হয়, এই পুরনো ইমারতের প্রতিটি ইঁট আমায় ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখছে।··· আমি সেই যুবকের নাম মনে করার চেষ্টা করতে থাকি, যে একহাজার ক্যাডেটের খাবারে বিষ নিশিয়ে দিয়েছিল।

আমজাদিয়া হোটেলের সামনে দেয়ালে একটা উর্দ্দু পোষ্টার মারা হচ্ছে। মোটা হরফে লেখা—'ন্যাশনলিস্ট মুসলিম কনভেনশান মুর্দাবাদ !·· গদ্দারো-সে হুঁশিয়ার !'

সেই নফরত-আমেজ পোষ্টার পড়ে এক মৌলানা ক্রোধে বিড়বিড় করতে থাকেন—'হুঁ, এইসব নদ্দাফ-এর বাচ্চারা তুলো ধোনা ছেড়ে এখন দেশ ধোনা শুরু করেছে। এদের উপযুক্ত শিক্ষা দেয়া দরকার। ন্যাশনালিষ্টের বাচ্চা !'

আমার বমির উদ্রেক হয়। রিক্সায় বসে আমি নিজের নাড়ী আঙ্গুলে চেপে ধরি। সাংঘাতিক বুক কাঁপতে থাকে। ঘামে শরীর ভিজে জবজবে হয়ে পড়ে।···চায়ের স্বাদে সামান্য টক্‌ ছিল কি ?···

ডানদিকে জেনারেল হাসপাতাল, আর বাঁদিকে পুলিশ ষ্টেশন। ভাবি, কোনদিকে প্রথমে যাওয়া ঠিক হবে।

কিন্তু রিক্সাঅলা জিজ্ঞেস করতে জবাব দিই, 'রাজেন্দ্রনগর চলো।'

একটি সাহিত্যগোষ্ঠীতে 'নতুন গল্প' 'গল্প-বিরোধী' 'আজকের গল্প' 'আগামীকালের গল্প' সম্পর্কে ক্রমাগত চারঘণ্টা চুপ করে বাদ-বিবাদ শোনার পর সোজা বাড়ী ফেরার সাহস হয় না। এমন অবস্থায় গঙ্গার ধারে কিংবা 'বারে' বসে নিজেকে খোঁজ করতে হয়। কিন্তু রিক্সাঅলা জিজ্ঞেস করতে জবাব দিই, 'রাজেন্দ্রনগর চলো।'

গোলমার্কেটের কাছাকাছি পৌঁছে প্রতিবারের মত নিজের ফ্ল্যাট এবং কামরা দুর থেকেই দেখি। ঘরে আলো দেখে মাথা ঘুরে যায়— 'এবার যাই কোথায় ?'

মন শক্ত করি—'যে কেউ হোক না কেন, ক্ষমা চেয়ে নেবো। কোন অছিলায় তাকে বিদেয় করে দেবো।'

সিঁড়িতে উঠতে উঠতে আমি নিজেকে গোটা পৃথিবীর ঝামেলায় জড়িয়ে নিই। পৃথিবীর প্রতি বিরক্ত এমন একজন লোকের মুখোশ চেহারায় এঁটে দরজার কড়া নাড়ি। কিন্তু দরজা খুলতে দেখি স্ত্রীর চোখে-মুখে খুশীর লালিমা ছড়িয়ে পড়েছে। আমার ঝোলা মুখের দিকে ওর দৃষ্টিই পড়েনি। উচ্ছ্বসিত গলায় বলে, বলো ত, কে এসেছে ?'

আমি অবাক হবার সুযোগ পাই না। হাসতে-হাসতে নগমা এসে সেলাম করে। স্ত্রী বলে, 'ও হো! তিন ঘণ্টা ধরে আমরা হাসছি।..তুমি কোথায় ছিলে ?...আর, তুমিও বেশ লোক! কখনও বলো নি ত।'

"কি বলিনি ?" আমি জিজ্ঞেস করি!

"তুমি হিন্দু নও, মুসলমান।" আমার ঘর থেকে স্বর ভেসে আসে।

দেখি, ফাতিমা দি গোটা ফ্ল্যাট আলোকিত করে বসে আছেন। বোরখা মেঝের ওপর পড়ে আছে। বোরখা নয়, কালা-কালা ন্যাকড়া।

'এটা কি করে হলো? কে··· ?'

স্ত্রী বলে, 'কে আবার···তোমার আদরের মেয়ে নৌমী···যতক্ষণ না বোরখা খুলছেন, চেঁচাতে থাকে। যেই বোরখা খুলে রেখেছেন, অমনি খামচে-আঁচড়ে বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।'

"ও আছে কোথায়?"

দেখি, ফাতিমাদির কোলে আঁচলের তলায় ঘাড় গুঁজে বসে আছে, দুষ্টু। কোন অপরাধ করার পর এই রকম মুখ করে বসে থাকে।

'কোল থেকে নাবছেই না। গর্‌গর্‌ করছে।' নগমা বলে।

উনিশ-কুড়ি বছর পরে দেখি, ফাতিমা দি আগের মত যেমন-কে-তেমন আছেন। কেবল, চেখের ধারে কয়েকটা নতুন রেখা ফুটে উঠেছে।

কার হাসি ফেটে পড়ছিল থেকে থেকে। গপ্পো শোনাতে শুরু করে—"নৌমীকে বেঁধে আমি দরজা খুলি। ইনি জিজ্ঞেস করেন, 'অজীজ বাড়ী আছে?' আমি বলি, 'কে অজীজ?'···অজীজ নয়, অজিত।' তো বললেন—'হ্যাঁ-হ্যাঁ শুনেছি সে নাকি নিজের নামের অক্ষর পাল্টে নিজেকে হিন্দু করে নিয়েছে, এবং এক বেচারী হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করেছে।' আমি তো অবাক···!"

'আচ্ছা! তো, ভাবিজান এখনও রহস্যাড়ালে আছেন। কি গো অজীজ? এ ভাবে কারো ধর্মনষ্ট করা কালপাহাড় ছাড়া আর কি? তবুও, তোমাকে আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। ওস্তাদ বটে! মূর্তিপূজারী হবার পর নিজের দেবতা নির্বাচন করেছ এমন একজন দাড়িঅলা যিনি কলমা পড়ে···'

তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের মূর্তির দিকে এ ভাবে ইশারা করতে দেখে আমরা সকলেই অট্টহাসিতে ফেটে পড়ি।

হাসির ঢেউ থামতে আমি জিজ্ঞেস করি, 'আচ্ছা এবার বলুন। আপনি কোথায় ছিলেন? কোথায় আছেন?'

'কবরে ছিলাম, কবরে আছি।'

স্ত্রী রান্নাঘরে চলে যায়। আমার মনে হয়, এখন এ প্রশ্ন করা উচিত হয়নি।

ফাতিমা দি জিজ্ঞেস করেন, 'তুমি কি ভেবেছিলে? পাকিস্তানে চলে গেছি? তাই না?'

'আপনি কেন পলিটিক্স ছেড়ে…'

'এটা আমায় কেন জিজ্ঞেস করছো? ঐ সব নবাবজাদাদের জিজ্ঞেস করো না কেন, যারা রাতারাতি দেশপ্রেমী হয়ে কংগ্রেসের তাঁবুতে ঢুকে পড়েছে— কাঁধে ছোরা নিয়ে। নেতাদের কাছ থেকে কেন জবাব-তলব কর না? কাল ওব্দি গান্ধী-জওহর-প্যাটেল কে সরাসরি গালাগাল করা লোক, জাতীয় পতাকা পোড়ানো সাম্প্রদায়িক লীগিদের সম্মান-মর্য্যাদা দিয়েছে, অথচ দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন-কারীদের দুধের মাছির মত বার করে ছুঁড়ে ফেলেছে।…তুমি নিজেকে এই প্রশ্ন কেন কর না…' ফাতিমাদির চেহারা লাল হয়ে ওঠে। আমার আনন্দ হয়। বাধা দিই—'কিন্তু, এভাবে আপনার চুপ হয়ে যাওয়া…'

'চুপ?' মনে হল সিংহী হুঙ্কার দিয়ে ওঠে—'এই সব জালিমেরা আমার ওপর কত কি নৃশংস ব্যবহার করেছে, তুমি তার কতটুকু খবর রাখো?…আমি কোন দরজার কড়া নাড়িনি, বলতে পারো? কিন্তু, দিল্লী থেকে পাটনা ওব্দি সর্বত্র গদীধারীরা আমার মগজের চিকিৎসার জন্য শলাহ্ দেয়। শাদী করে ছেলে জন্ম দেয়ার নসীবৎ দেয়। অবশেষে ভীতিপ্রদর্শন… ওহ্… অজীজ।…'

ফাতিমাদির গলা ভারি হয়ে আসে। স্ত্রী কখন যে এসে দাড়িয়েছিল। বলে, 'তুমিও অদ্ভুত লোক…।'

নৌমী এতক্ষণ ঘাড় গুঁজে বসেছিল, ফাতিমাদির চেহারা শুঁকে কুঁই-কুঁই করতে থাকে।

'এখনও লোকেদের হুঁকা হয়নি। এদের স্রেফ গদীর মোহ। দেশ জাহান্নামে যাক্ না কেন তাতে কি?' ফাতিমাদির কণ্ঠস্বরে গভীর পীড়া ফুটে ওঠে— 'তুমি···তুমি···অফসানা লেখো, তাই না?··· মনে পড়ে, আজাদীর পূর্বে প্রগতিশীলেরা গীত-আদীবে, কবিতা-নজমায়, গল্প-অফসানায় হিন্দু-মুসলিম ইত্তেহাদের কথা, মানবতার দোহাই, না-জানি আরও কতকিছু ভরিয়ে রাখত, আজাদীর পর সহসা তাদের গলা বন্ধই হয়নি, বরং একেবারে পালটে গেছে। আওয়ায়ের কসম খাওয়া লোকেরা টুকুর-টুকুর দেখতে থাকে, অথচ সাম্প্রদায়িক আজহদেরা গোটা দেশকে রসাতলে নিয়ে যায়।'

স্ত্রী বাধা দেয়—'ফাতিমাদি, খাবার ঠাণ্ডা হয়ে পড়ছে।'

টাউনহলে ন্যাশনালিস্ট-মুশলিম-এর প্রস্তুতি বেশ জাঁকজমক করে হতে থাকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রতিনিধিদের আসার খবর ছাপা হতে থাকে। এবং এইসব খবরের সঙ্গে মোটা ঘন লাল কালিতে এই কনফারেন্স বিরোধীদেরও সমাচার ছাপে। প্রত্যহ দু তরফ থেকে শতেক নামের সঙ্গে বয়ান ছাপা হয়। বিরোধীদের বক্তব্য, কেউ অ-ন্যাশনালিস্ট নয়, সব মুসলমানই ন্যাশনালিস্ট। নিজেকে ন্যাশনালিস্ট বলা লোকেরা খোলাখুলি বলে, পুরনো মুশলিম-লীগিদের মন-মেজাজে সম্প্রদায়িকতার বিষ আছে। তাদের বিশ্বাস করা যায় না।

অনেকদিন কোন রাজনৈতিক সম্মেলনে শরিক হইনি। কিন্তু এবার নিজের 'কর্তব্য' মনে করে এই সম্মেলনে সম্মিলিত হবার জন্য হাজির হই। কিন্তু, সেখানকার দৃশ্য দেখে ফুটপাথের ওপরেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ি।

টাউনহলের সামনে রাস্তার দু-পাড়ে হাজার খানেক লোক দাঁড়িয়ে স্লোগান দিচ্ছিল। গালি-গালাজ, স্লোগান এবং থেকে-থেকে ইট-পাটকেল ও পাথরের ঝাঁক!

পুলিশের লোকেরা চুপচাপ সার বেঁধে দাঁড়িয়েছিল; কারণ প্রদর্শনকারীদের আচরন-বিধি 'কুলীন মুশলিম' নেতাদের সাহেবজাদা এবং বড়বড় অফিসারদের ছেলেরা করছিল। আমার মনে হলো, আবার সেই ১৯৪৭ এ ফিরে গেছি। বাতাসে আবার সেই স্ফুলিঙ্গ, সেই শ্লোগান, সেই দৃশ্য, সেই চেহারা!

'দেখো! দেখো! ঐ যাচ্ছে কাফেরের বাচ্চা।'

'তড়তড়াক্। তড়তড়াক্!'

'ঐ যে হারামখোর! মার শালাকে!'

'শুয়ারের বাচ্চা!'

'তড়তড়াক!'

এখন তারা প্রতিটি ডেলিগেটকে ধরে মারতে শুরু করে। উত্তেজনার ঢেউ তীব্র হয়ে ওঠে। শ্লোগান, গালাগাল এবং ইট-পাটকেলের বর্ষণ জোরে শুরু হয়।

'মহাত্মা গান্ধীর জয়।'

একটি মিহি অথচ দৃঢ় কণ্ঠস্বর। হঠাৎ সব কিছু থেমে পড়ে। লোকেরা দেখে, অঞ্জুমান ইসলামিয়া হলের প্রবেশ দ্বারে—আবদুল বারী দরজার সামনে একজন মহিলা শ্লোগান দিচ্ছেন।

ফতিমা দি? আমার নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারি না। দেখি, সত্যি ফাতিমাদি।

'কে এই মহিলা?'

'কোন হিন্দু?'

'না, না, চেনো না ওকে। ঐ কুত্তি।'

'ফাতিমা? শ্‌শালী আবার কোত্থেকে হাজির হলো?"

'কুত্তি!'

পাগলদের একটা দল উন্মত্ত নৃত্যে, অশ্লীল গালাগাল দিতে দিতে ফাতিমাদির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফাতিমাদি হাসিমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন। মুহূর্তে হিংস্রজন্তুরা তাঁকে মেঝের ওপর আছড়ে ফেলে,

তারপর চুল ধরে টানতে শুরু করে। দুদিকে দণ্ডায়মান ভিড় হাততালি দিয়ে ওঠে—সাবাস! যখন পুলিশের দল সেখানে গিয়ে পৌঁছয় তারা ততক্ষণে ফতিমাদির সমস্ত আবরণ খুলে ফেলেছিল। আমি এরপর আর কিছু দেখতে পারিনি।

কয়েকদিন পর অনেক সাহস সঞ্চয় করে—আমরা দুজনে হাসপাতালে ফতিমাদিকে দেখতে যাই।

কেবিনের দরজার কাছে নগমার সাক্ষাৎ পাই। আমাদের দেখে আকুল ক্রন্দনে ফেটে পড়ে।

'জন্তুগুলো ফতিমাদির মুখে এসিডের বোতল ঢেলে দিয়েছে। গোটা মুখ পুড়ে কালো হয়ে গেছে। একটা চোখও নষ্ট হয়ে গেছে। হাতের হাড় ভেঙ্গে গেছে।'

শব্দ পেয়ে তাঁর ঠোঁট জোড়া কেঁপে ওঠে। সম্ভবতঃ হাসতে চেষ্টা করেন। তারপর ধীরে বলেন—'দূর পাগল। এখানে কাঁদতে এসেছিস? জলুস ছ্যাখ। বৌদি! কাল সুজীর পায়েস কি বলে যেন পরমান্ন রেঁধে এনো। নৌমীকেও সঙ্গে এনো।'

ফতিমাদিকে কখনও এরকম দেখবো, কল্পনাও করিনি আমি।

এক আদিম রাত্রির গন্ধ

□□□□□□□□□□□□□□□□

…না… করমার ঘুম আসবে না।

নতুন পাকাবাড়ীতে ওর কখনও ঘুম আসে না। চুন আর বার্নিশের গন্ধে ওর কানপটির ধারে সিকি-ভর ব্যথা চিন্‌চিন্ করতে থাকে। পুরনো লাইনের পুরনো ইষ্টিশান হাজার পুরনো হোক, সেখানে ঘুম আসেই। যা, নাকের ভেতর আবার সুরসুরি লাগছে শালা!…

করমা হেঁচে ওঠে। নতুন ঘরে ওর হাঁচি গুঞ্জরিত হয়।

'করমা, ঘুম আসছে না?' ক্যাম্পখাটে পাশ ফিরতে ফিরতে বাবু জিজ্ঞেস করেন।

গামছা দিয়ে নাকের ডগা পরিষ্কার করতে করতে করমা বলে, 'এখানে ঘুম সহজে আসবে না, আমি জানতাম বাবু!'

'আমারও ঘুম আসবে না।' বাবু সিগারেট ধরিয়ে বলেন, 'নতুন জায়গায় প্রথম রাত আমার ঘুম আসে না।'

করমা জিজ্ঞেস করতে চাইছিল, নতুন পাকাবাড়ীতে কি বাবুর চুনের গন্ধ লাগে? কানপটির ধারে সবসময় ব্যথা জাগে কিনা?··· বাবু একটা গান গুণগুণ করেন। একটা কুকুর গস্ত করতে করতে সিগনাল কেবিনের দিক থেকে আসে, তারপর বারান্দার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। করমা চুপচাপ কুকুরের মতলব বোঝার চেষ্টা করে। কুকুরটা বাবুর খাটিয়ার দিকে থুতনি উঁচু করে বাতাস শোঁকে। এগিয়ে যায়। করমা বুঝে ফেলে—নিশ্চয় জুতোখোর কুকুর, শাল্লা! ···না, শুধু শুঁকছে। কুকুরটা এবার করমার দিকে মুখ ফেরায়। বাতাস শুঁকতে থাকে। তারপর মুসাফিরখানার দিকে দুল্‌কি চালে এগিয়ে যায়।···

বাবু জিজ্ঞেস করে, 'তোর নাম করমা, নাকি করমচাঁদ নাকি করমু?'

···সাতদিন যাবৎ একসঙ্গে থাকার পর, আজ মাঝরাতে বাবু মন খুলে একটা প্রশ্নের মত প্রশ্ন করলেন।

'বাবু, নাম আমার করমা-ই। অবশ্য লোকেদের হাজারটা মুখ হাজার নামে ডাকে।··· নিতাইবাবু কোরমা বলতেন, ঘোষ বাবু করিমা বলে ডাকতেন, সিংজী বরাবর কামাই বলতেন আর আসগর বাবু সবসময় করম-করম বলতেন। খুশী থাকলে ঠাট্টা করতেন—হায়, আমার করম! নামে কি আর আসে যায় বাবু। যা মনে চায়, ডাকবেন। হাজার নাম··!'

'তোর বাড়ী সাঁওতাল পরগণায়, রাঁচি-হাজারিবাগের দিকে ?'

এই প্রশ্নে করমা একটু থতমত খায়। এমন প্রশ্নের জবাব দেয়ার সময় ও 'রম্‌তা যোগীর মুদ্রা ধারণ করে। বাড়ী ? যেখানে শরীর, সেখানে বাড়ী। মা-বাপ-ভগবান !...কিন্তু বাবুকে এরকম জবাব দেয়া যায় না।...

...বাবুও বেশ। নামের অর্থ ধরে অনুমান করে নিয়েছেন—সাঁওতাল পরগণা কিংবা রাঁচি-হাজারিবাগের দিকেই বাড়ী হবে, কোন এক গাঁয়ে ? করমা পার্বনের দিন জন্ম হয়েছিল হয়তো, তাই নাম হয়েছে করমা। মাথা, কপাল, ঠোঁট আর দেহের গড়ন দেখেও...

..বাবুকে বেশ গুণী বলেই মনে হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে করমার কিছু জানা নেই। অথচ বাবু নাম আর কপাল দেখে সবকিছু বলে দিচ্ছেন। হ্যাঁ, এতোদিন পর একজন বাবু মিলেছে, গোপাল-বাবুর মতো !

করমা বলে, 'গোপালবাবুও এই কথা বলতেন। এই 'করমা' নাম গোপালবাবুর দেয়া।'

করমা তখন গোপালবাবুর গল্প বলতে শুরু করে, 'গোপালবাবু বলতেন, আসাম ফেরৎ কুলীগাড়ীতে একটা 'ডোকোর' ভেতর তুই পড়েছিলি, বিল্টি-রসিদ ছাড়াই। বেওয়ারিস মাল !'

—যাক্‌, বাবুর ঘুম এসেছে। নাক ডাকতে শুরু করেছে। গোপালবাবুর গপ্পো অসম্পূর্ণ থেকে গেল।

—কুকুরটা আবার গস্ত করতে করতে আসে। এটা যে কার্তিক মাস। শালা, একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে। হাঁপাচ্ছে।—বাঃ, তুইও এখানে শুবি ? উঁহু, শালার গায়ের গন্ধ এতদুর অব্দি আসছে—ধেৎ ! ধেৎ !

বাবু জেগে উঠে জিজ্ঞেস করেন, 'হুঁ-উঁ-উঁ ! তারপর কি হলো তোর গোপালবাবুর ?'

কুকুরটা বারান্দার নীচে চলে যায়। মুখ ফিরিয়ে দেখতে থাকে। গরর্, গরর্ শব্দ করে। তারপর বার দুই তিন চাপা গলায় 'বুফ্-বুফ' শব্দ করে জেনানা মুসাফিরখানার ভেতর ঢুকে পড়ে, যেখানে পয়েণ্টম্যান শোয়।

'বাবু, ঘুমিয়ে পড়লেন নাকি ?'

যাক্, বাবুর আবার ঘুম এসে গেছে। বাবুর নাক ঠিক 'বাবুগিরি' শব্দ করেই ডাকে। পয়েণ্টম্যানের ডাক, মনে হয় কাঠ চিঁড়ছে! গোপলবাবুর নাক বাঁশির মত বাজতো—সুর তুলে! আস্‌গরবাবুর গর্জন, সিংজী ভোঁস ভোঁস করতেন আর সাহুবাবু ঘুমের মধ্যে বলতেন—'অ্যাঙ্গি, ডাউন দে, গাড়ী ছেড়েছে!'

হাজার বার, লক্ষবার চেষ্টা করেও নিজেকে রেলের স্লিপার থেকে আলাদা করতে পারে না, করমা। ছটফট্ করে ওঠে। চেঁচায়, কিন্তু একটু নড়ন-চড়ন হয় না ওর শরীর। ও জুড়ে থাকে। ঝক্‌ঝক্ করতে করতে ইঞ্জিন ওর গলা ও পা কেটে দিয়ে চলে যায়। লাইনের এক পারে ওর মুণ্ডু পড়ে থাকে, অন্য পারে পা দুটো ছিট্‌কে পড়ে। ও তাড়াতাড়ি নিজের কাটা পা দুটো কুড়িয়ে নেয়। ওমা, এ যে অ্যাণ্টনি গাড্ সাহেবের বর্ষাতি জুতো জোড়া। গাম্বুট!—তার মুণ্ডুটার কি হলো ? ধেৎ, ধেৎ! শালা, নাক-কান খুব চিবুচ্ছে!

'করমা ?'

'ধেৎ-ধেৎ!'

'ওঠ করমা, চা কর!'

করমা ধড়ফড় করে উঠে বসে। ওমা, সকাল হয়ে গেছে। মালগাড়িকে 'থ্রু পাশ' করিয়ে পয়েণ্টম্যান হাতে বেতের ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে আসছে। শালা! এমনও স্বপ্ন হয় নাকি ? বারো বছরে, এই প্রথম এমন অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে করমা।

বারো বছরে একদিনের জন্যেও রেলওয়ে লাইন থেকে দূরে যায়নি, করমা 'অ্যাক্সিডেণ্টের' স্বপ্নও কখনও দেখেনি।

করমা রেল কোম্পানীর চাকর নয়। ও চাইলে পোর্টার, খালাসী, পয়েন্টম্যান কিংবা পানিপাঁড়ের চাকরী পেতে পারত। খুব সহজে রেলওয়ে চাকরিতে ঢুকতে পারত। কিন্তু মনকে বোঝায় কে? মন মানলো না! রেল কোম্পানীর নীল কুর্তা আর ইঞ্জিন ছাপ বোতামের সখ ওর কখনও হয়নি।

শুধু রেল কোম্পানীই নয়, কারুর চাকরী করমা করেনি কখনও। নামধাম জিজ্ঞেস করার পর লোকেরা পেশার কথা জানতে চায়। করমা জবাব দেয়—'বাবুর 'সঙ্গে' থাকি। এক পয়সাও মাইনে না-নেয়া লোককে তো আর চাকর বলতে পার না।'

গোপালবাবুর সঙ্গে, টানা পাঁচ বছর। তারপর, কত যে বাবুর সঙ্গে ছিল, তা গুণে বলতে হবে। তবে একটা কথা, 'রিলীফবাবু' ছাড়া কোনও 'সালটন বাবুর' ও কখনও থাকেনি। 'সালটন বাবু' মানে কোনও ইষ্টিশানে 'পারমান্টি' চাকরী করা—ফ্যামিলী নিয়ে থাকেন যারা!

গোপালবাবু! অমন বাবু কি আর পাওয়া যাবে? করমার মা-বাপ, ভাই-বোন, পরিবার—যা বলেন, সব ঐ এক গোপালবাবু! রসিদ-বিল্টি ছাড়া বেওয়ারিস মাল ছিল, করমা। রেলওয়ে থেকে ছাড়িয়ে নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন গোপালবাবু। যেখানে যেতেন, করমাও সঙ্গে যেতো। যা খেতেন, করমাও খেতো। কিন্তু, লোকের মতিগতির কথা কি বলা যায়! রিলিফের কাজ ছেড়ে 'সালটনি' কাজে গেলেন। তারপর, একদিন বিয়ে করে ফেললেন। বৌমা গোপালবাবুর ফ্যামিলি—রাম, রাম! ওকি মেয়েমানুষ? সাক্ষাৎ পেত্নী! গোটা দিন গোপালবাবু ঠিক থাকতেন। সন্ধ্যে হলেই তাঁর প্রাণ যেন পাখীর মত লুকিয়ে বেড়াতো···মাঝরাতে কখনও কখনও ইসপেশাল পাস করাবার জন্যে বাবু বেরোতেন। মনে হতো, আমেরিকান রেলওয়ে ইঞ্জিনের বয়লারে কয়লা ঠেসে বেরিয়েছেন।···করমা কোয়ার্টারের বারান্দায়

ঘুমুতো। তিনমাস ধরে রাতে ওর ঘুম হয়নি, ভালভাবে। বৌমা ফোঁস ফোঁস করতো—বাবু মিন মিন গলায় কিছু বলতেন। তারপর শুরু হতো কান্নাকাটি, গালি-গালাজ, মারামারি। বাবু পালিয়ে বাইরে বেরোতেন, আর ঐ মানুষটি ঝাঁপিয়ে তাঁর চুলের মুঠো ধরে ফেলতো।···তখন করমা একটা উপায় বার করে। ঐ রকম সময়ে ও উঠে দরজা খট খট করে বলতো, 'বাবু, ইসপেশালের কল বাজছে।'···বাবুকে কতদিন আর রক্ষা করে করমা?···বৌমা একদিন চেঁচিয়ে ওঠে—'এই ছোঁড়া হারামজাদাকে দূর করে দাও। ও চোর, চো-ও-ও-র্!'

তারপর থেকেই কোনও ইস্টিশানের ফ্যামিলী কোয়ার্টার দেখলেই করমার মনের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ গলা বেজে ওঠে—চোওওর! হারামজাদা! ফ্যামিলী কোয়ার্টারই বা কেন—জেনানা মুসাফিরখানা, জেনানা ক্লাস, জেনানা নামেই করমার বমি উঠে আসে।

এক বছরেই গোপালবাবুকে হাড়গোড় শুদ্ধ চিবিয়ে খেয়ে ফেলে, ওই জেনানা! ফুলের মত নরম গোপালবাবু! জীবনে প্রথমবার ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিল।

রমতাযোগী, বহতা পানী আর রিলিফিয়াবাবু! হেডকোয়ার্টারে চব্বিশ ঘণ্টা পেরোতে-না-পেরোতেই পরোয়ানা জারি হয়—অমুক ইষ্টিশানের মাষ্টার বাবু অসুস্থ, সিক রিপোর্ট এসেছে। এক্ষুনি জয়েন করো। রিলিফিয়া বাবুর বিছানা-পুটলি সব সময় রেডি থাকা চাই। কম পক্ষে এক সপ্তাহ, আর বেশী হলে তিনমাসের ওপর এক জায়গায় থিতু হয়ে থাকতে পারে না কোনও রিলিফ বাবু। কাঠের একটা বাক্সয় গোটা সংসার পাতা আজ এখানে, কাল ওখানে। পানিপাঁড়া থেকে ভাতগাঁ, কুরেঠা থেকে রৌতাড়া। আবার, হেডকোয়ার্টার—কাটিহার!

গোপাল বাবুই ঘোষবাবুর সঙ্গে কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল—খুব ভালো বাবু! ভালভাবে রাখবে। কিন্তু, ঘোষবাবুর সঙ্গে

এক মাসেরও বেশী থাকতে পারেনি, করমা। ঘোষবাবুর ছিল অকারণে গালি-গালাজ দেয়া অভ্যাস! মুখ খারাপ গালি-গালাজ। মা-বোন তুলে গালি-গালাজ। এ ছাড়া ঘোষবাবুর অন্য কোন দোষ ছিল না। নিজের লোকের মতো রাখতেন। ঘোষবাবুর সঙ্গে আজও দেখা হলে গালাগাল দিয়েই কথা শুরু করেন—'কি বে করমা? কার সঙ্গে আছিস আজকাল বানচো?'

ঘোষবাবুর মা-বোন তুলে গালাগাল দেবার কেউ নেই। নয়তো বুঝতেন মা-বোনের নাম শুনে লোকের রক্ত কিভাবে টগবগ করে ওঠে। কোনো ভদ্রলোককে এমন খারাপ গালাগাল দিতে শোনেনি করমা, আজ পর্যন্ত।

রামবাবুর সমস্ত ব্যবহার ভালই ছিল। কিন্তু বড্ড 'পিরীতি' লোক। যে ইষ্টিশানে যেতো, সেখানকার পয়েন্টম্যান-পোটার-সুইপারকে আড়ালে ডেকে গুজুর গুজুর করে কথা বলতো। তারপর, রাত্রে কখনও মালগোদামের দিকে, কখনও বা জেনানা মুসাফির খানায়, কিংবা কখনও জেনানা পায়খানায় ছিঃ—ছিঃ যেখানে যেতো ছোঁক্ ছোঁক করতো—'কি হে আসলি মাল-টালের কোন যোগাড়-যন্তর হবে না?' শেষে তাই ঘটল, করমা যা ভেবেছিল—মালই ওর কাল হলো। গত বছর যোগবানী লাইনে এক নেপালী কুকরি দিয়ে দু-টুকরো করে শেষ করে দিলো। হুঁ আরও মাল ওড়াও! যেমন নিজের ইজ্জৎ, তেমনি পরের।

সিংজী ছিলেন ভারি 'পুজাবী' মানুষ! সীতা সহ রাম-লক্ষ্মণের পট সর্বদা তাঁর থলেতে থাকতো। রোজ ভোর চারটেয় স্নান করে পুজোর ঘণ্টা নাড়াতেন। এদিকে কলের ঘণ্টা বেজে উঠতো। যে ঘরে ঠাকুরের থলে থাকতো, সেখানে স্নান না করে পা রাখা অসম্ভব ছিল। কেউ কি নিজের শরীর অমন ভাবে সব সময় সামলে রাখতে পারে? কে দিনে দশবার স্নান করে, আর হাজারবার পা ধোঁয়! তাও, আবার শীতকাল। কোনকিছু যেই ছুঁয়েছে অমনি

—হুঁ-হুঁ-হু—হাঁ-হাঁ-হাঁ—আরেরেরে—ছুঁয়ে দিলি তো! এমন শুচিবায়ু লোকের রেল কোম্পানীতে আমার দরকার কি? সিংজীর সঙ্গে থাকা গেল না।

সাহুবাবু দিল-দরিয়া লোক ছিলেন। কিন্তু এমন মদোমাতাল—দিনদুপুরে দু-নম্বর মদ এক বোতল গিলে মালগাড়ী 'থুরুপাস' দিয়ে দেয়, ফলে গাড়ী ধাক্কা খায়। করমার মনে আছে, অ্যাকসিডেণ্টের খবর শুনে সাহুবাবু আরেক বোতল টেনে নেয়। শেষে ডাক্তার মাথা-খারাপের 'সার্টিফিকেট' দেয়।

কিন্তু, ওই অ্যাক্‌সিডেণ্টের সময়েও করমা কোনও রাতে এ ধরনের স্বপ্ন দেখেনি।

নাঃ ভোর বেলা এ ধরনের অলুক্ষুনে স্বপ্ন বাবুকে শুনিয়ে করমা ভাল করেনি! রেলওয়ে চাকরীতে এখন সবে ঢুকেছেন।

নাঃ বাবুর মেজাজের হদিস-টদিস এখনও করমা বুঝতে পারেনি। প্রায় সপ্তাহকাল এক সঙ্গে থাকার পর, কাল রাতেই প্রথম মন খুলে দুটো সওয়াল-জবাব করলেন বাবু। এই জন্যেই ত সকালে করমা মন খুলে নিজের স্বপ্নের কথা শুরু করেছিল। চায়ের পেয়ালা সামনে রাখার পর হেসে বলে, 'বাবু, কাল রাতে আমি এক অ-দ্ভু-উ-উ-ৎ স্বপ্ন দেখেছি। ঘর্ঘর করতে করতে ইঞ্জিন আসছে, লাইনে জুড়ে থাকা আমার শরীর একতিল ও নড়তে পারছে না। মুণ্ডু এধারে আর পা দুটো লাইনের ও ধারে···এ্যাণ্টনী গাড সাহেবের বর্ষাতি জুতো-জোড়া গাম্বোট!'

'ধেৎ! কি সব মুণ্ডুহীন কথা শুরু করেছিস সকাল সকাল? গাঁজা-টাজা টানিস নাকি?'

বাবুকে স্বপ্নের কথা শুনিয়ে করমা ভাল করেনি।

করমা উঠে গিয়ে তাকে রাখা আয়নায় নিজের মুখ দেখে। তারপর অ-দ্ভু-উ-উ-ৎ শব্দটা বলে দেখে। ছিঃ, ওর ঠোঁট তিতিরের ঠোঁটের মতো।

'কি করমচান ! কি রান্না হচ্ছে ?'

পানি পাঁড়ে ভালোমানুষ। পুরনো জানাশোনা আছে করমার সঙ্গে। কয়েকটা ইষ্টিশানে একসঙ্গে থাকার-সঙ্গী। কিন্তু, এই পয়েন্টম্যানটা বড্ড গোলমেলে লোক মনে হয়। প্রতিটি কথায় ফিচ্‌ ফিচ্‌ করে হাসে।

'করমচান, বাবু কোন হাতের ?'

'কেন ? বাঙ্গালী।'

'ভাই, বাঙ্গালীর মধ্যেও সাড়ে বারো বর্ণের লোক আছে।'

'পানি-পাঁড়েজী, তাতো আমি জানি না। তবে খুব গুনী লোক। আপনার নামের মানে ধরে—চেহারা দেখে সব বলে দিতে পারেন। যাঃ ঘণ্টা পড়ে গেল গাড়ীর, এদিকে আমার তরকারি এখনও উনুনে।'

পানি-পাঁড়ে যেতে যেতে বলে যায়, 'একটু তরকারি লুকিয়ে রাখিস্‌ করমচান !'

বাড়ি কোথায় ? কি জাত ? মনিহারীঘাটের মস্তান বাবার শেখানো বুলি সব জায়গায় খাটে না—হরিকে ভজে সো হরি হোই ! কিন্তু, হরির ও যে জাত ছিল ! যা, এই ঘাটের গাড়ীর ইঞ্জিন কি করে এ লাইনে পাঠিয়ে দিল আজ ? সাঁওতালি বাঁশির মতো মিষ্টি আওয়াজ—সিঁ-ঈ-ঈ !

যা বাব্বা ! একটাও পাসিঞ্জর নামলো না এ গাড়ী থেকেও। কেন যে এত খরচা করে রেল কোম্পানী এখানে ইষ্টিশান করেছে, করমার বুদ্ধিতে কুলোয় না। লাভ ? নামেই কেবল আমদপুরা, আমদানি ভোঁ ভোঁ। সাতদিনে স্রেফ ছুটো টিকিট কাটা হয়েছে, আর মোটে পাঁচজন পাসিঞ্জার নেমেছে—তার মধ্যে আবার বিনে টিকিটের। এতদিন পর মাত্র পনরো থলে বেগুণ সেদিন বুক হয়েছে। পনরোটা বেগুণ দিয়েই কাজ বাগিয়ে নিল, ওই বুড়ো। বেগুণঅলার কথাবার্ত্তাও ছিল অদ্ভুত। করমার সঙ্গে জমিয়ে গপ্পো করতে চাইছিল বুড়ো। বাড়ি কোথায় ? কি জাত ? বাড়িতে কে কে

আছে? করমা সব জিজ্ঞাসার একটিই জবাব দিয়েছিল—উপরের দিকে হাত তুলে! বুড়ো হেসে ফেলেছিল। অদ্ভুত হাসি!

ঘাটের গাড়ী! সিঁ-ঈ-ঈ-ঈ!

করমা মনিহারী ঘাট ইস্টিশানেও ছিল। একবার তিন মাসের জন্য; দ্বিতীয়বার এক মাস। মনিহারীঘাট ইস্টিশানের কথা স্বতন্ত্র। কোথায় মনিহারী ঘাট আর কোথায় আদমপুরার এই পুঁচকে ইস্টিশান।

নতুন জায়গায়, নতুন ইস্টিশানে পৌঁছে আশেপাশের গাঁয়ে এক আধবার ঘোরাফেরা না করলে করমার কেন জানি ভাল লাগে না। মনে হয়, অন্ধকূপে পড়ে আছে। ঐ যে 'ডিস্‌টান্‌ সিংগলের' ওধারে বহু দূর অবধি ক্ষেত-মাঠ ছড়িয়ে পড়ে আছে। ঐ যে কালো জঙ্গল, ঐ একা তালগাছ। আজ বাবুকে খাইয়ে-দাইয়ে করমা বেরোবে। এই ভাবে বসে থাকলে ওর পেটের ভাত হজম হবে না। যদি গাঁ-ঘরে, ক্ষেতে মাঠে ঘুরে না বেড়াতো, তাহলে কি করে ও গাছে চড়া শিখতো? সাঁতার শিখতো কোথা থেকে?

লাখপাতিয়া ইস্টিশানের নামটা কি জব্বর? কিন্তু ইস্টিশানে একটা ছাতু-মুড়ির দোকান নেই। আশে-পাশে পাঁচ ক্রোশ পর্যন্ত গ্রাম নেই। কিন্তু, ইস্টিশানের পুবে যে দুটো পুকুর আছে, তার কথা কি ভুলতে পারে করমা? আয়নার মত তকতকে জল। বৈশাখ মাসের দুপুরে ঘন্টার পর ঘন্টা এক গলা জলে দাঁড়িয়ে স্নান করার যে সুখ, তা মুখে বলে বোঝানো যাবে না।

সুভ্রা, কদমপুরা—সত্যি কদমপুরাই। ইস্টিশান থেকে শুরু করে গাঁ-ঘরে, অসংখ্য কদম গাছ। কদমের চাটনি খেয়েছে একযুগ হয়েছে।

ওয়ারিস্‌গঞ্জ ইস্টিশান, পাড়ার মাঝখানে। বড় বড় মালগুদাম, হাজার-হাজার গাঁট, ধান-চালের বস্তা, কয়লা-সিমেন্ট-চুনের পাহাড় সব সময় হাজার লোকের ভিড়! কারো চেহারা মনে নেই করমার

কিন্তু, ইস্টিশানের লাগা-উত্তর দিকে মাঠে তাবু ফেলে থাকা গাধা-অলা মগধি ডোমেদের কথা প্রায় মনে পড়ে। ঘাঘরা পরা মেয়েরা, হাতে বড় বড় বালা, কানে ঝুমকো, ন্যাংটো ছেলে, কানে গোল-গোল কুণ্ডল পরা মরদ! ওদের মুর্গি! ওদের কুকুর!

বথ্‌নাহা ইস্টিশানের চারদিকে হাজারটা বাড়ী গড়ে উঠেছে। কেউ কি বিশ্বাস করবে, পাঁচ বছর আগে বথ্‌নাহা ইস্টিশানে দিন দুপুরে তিতির ডাকতো।

কত জায়গা, কত লোকজনের কথা মনে পড়ে। সোনবরষার আম, কালুচকের মাছ, ভটোতরের দই, কুসিয়া গাঁয়ের আখ!

কিন্তু, সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ে মনিহারী ঘাট ইস্টিশান! একদিকে মাটি অন্যদিকে জল। একদিকে রেলগাড়ী, ওদিকে জাহাজ। এপারে ক্ষেত গাঁ-মাঠ, ওপারে সাহেবগঞ্জ—কাজরোটিয়ার নীল পাহাড়। নীলজল সাদা বালি! তিন এক চার। চার মাস ধরে তিরিশ দিনই গঙ্গায় চান করেছে করমা। চার জন্ম ওব্দি অভিশাপের কোনও প্রভাব হবে না। এমন সুন্দর নাম কোনও ইস্টিশানের হবে না—মনিহারী। বলিহারি! জেলেরা যখন নৌকা থেকে মাছ নামাতো, তার ঝলসানিতে চোখ ধাঁধিয়ে উঠতো।

রাতে, ওদিকে জাহাজ চলে যেতো—ধু ধু করতে করতে। এদিকে গাড়ী ঝকঝক করে কাটিহারের দিকে ছুটতো। অজু সাহেবের দোকানের ঝাঁপ বন্ধ হয়ে যেতো। তখন ঘাটে মস্তান বাবার মণ্ডলী বসতো।

মস্তান বাবা কুলি-কুলেরই লোক ছিলেন। মনিহারী ঘাটেই কুলির কাজ করতেন। একবার মন এমন উদাস হয়ে গেল যে দাড়ি ও জটা বাড়িয়ে বাবাজী হয়ে গেলেন। খঞ্জনী বাজিয়ে 'নির্গুন' গাইতে লাগলেন। বাবা বলতেম—কত ঘাট-বাটের জল দেখলাম—সব ফিকে। কেবল গঙ্গা জলই মিঠে। বাবা এক ছিলিম গাঁজা টেনে পাঁচটা কাহিনী শুনিয়ে দিতেন। সব বেদ-পুরাণের কাহিনী!

করমাও জ্ঞানের দু-চারটে বুলি মনিহারী ঘাটেই শিখেছে। মস্তান বাবার সৎসঙ্গে। কিন্তু, গাঁজা কখনও টানেনি। আজ বাবু যখন ঝাঁঝিয়ে উঠে বললেন, গাঁজা-টাজা টানিস নাকি—তখন মস্তান বাবার কথা মনে পড়লো করমার। বাবা বলতেন—সব জায়গার নিজস্ব একটা সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ হয়! এই আদমপুরার গন্ধের চোটে করমার খাওয়া দাওয়া রোচে না।

মস্তান বাবাকে বাদ দিয়ে মনিহারী ঘাটের কথা কখনও মনে পড়ে না।

'তাকে' রাখা আয়নায় করমা আবার নিজের মুখ দেখে। চোখ আধবোজা করে দাঁত বের করে হেসে মস্তান বাবার চেহারা নকল করার চেষ্টা করে—মস্ত রহো! (খুশী থেকো) সব সময় চোখ কান খুলে রাখবি। মাটি কথা বলে। গাছপালাও আপন লোকেদের চেনে। ফসলকে নাচতে গাইতে দেখেছিস কখনও? কাঁদতে শুনেছিস কখনও অমাবস্যার রাতে? হেঁ-হেঁ-হেঁ মস্ত রহো!

করমা জানে না এদিকে বাবু যে পেছনে দাঁড়িয়ে তার সব তামাশা দেখছেন। বাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'তুই জেগে-জেগে দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছিস বুঝি? অথচ বলছিলি গাঁজা খাই না?'

সত্যি সে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে স্বপ্ন দেখছিল। মস্তান বাবার চেহারা বট গাছের মত বিশাল হয়ে পড়ে। তাঁর মস্ত হাসি আকাশে বাজতে থাকে। গাঁজার ধোঁয়া উড়তে থাকে। গঙ্গায় ঢেউ জাগে। দূরে, জাহাজের ভোঁ শোনা যায়—ভোঁ—ওঁ—ওঁ—ওঁ!

বাবু বলেন 'খাবার বাড়! দেখি, কি রেঁধেছিস? তোকে নিয়ে তো ভারি মুস্কীল।

মুখে প্রথম গরাস গিলে বাবু করমার মুখ দেখতে থাকেন,—'আঃ, তুই তো খাসা রেঁধেছিস।'

খেতে খেতে বাবুর মন মেজাজ একেবারে পালটে যায়। রাতের

মতো আবার মন-খুলে গপ্পো করতে শুরু করেন, 'কে তোকে রান্না শিখিয়েছে ? গোপাল বাবুর বৌ ?

গোপাল বাবুর বৌ ? মানে বৌমা ? ও বলে, 'বৌমার মেজাজ এমন টকে থাকত যে কথা শুনলেই যেন কড়াইর টাটকা দুধ ফেটে যেত। উনি কাকে কি শেখাবেন ? মুখরা মেয়েমানুষ।'

'হুম্ কিন্তু এত সব কথা বলতে তোকে কে শিখিয়েছে ?'

মস্তান বাবার 'বাণী' মনে পড়ে করমার, 'বাবু, শেখাবে, আবার কে ? শহর শেখায় কোতোয়ালী !'

'তোর বৌয়ের খুব সুখ হবে !

বাবুর মন-মেজাজ এরকম ঠিক থাকলে একদিন করমা তাঁকে মস্তান বাবার পুরো কাহিনী শোনাবে।

'বাবু, আজ আমার একটু ছুটি চাই।'

'ছুটি। কেন রে ? কোথায় যাবি ?'

করমা একদিকে হাত তুলে দেখিয়ে বলে, 'এই, একটু ওদিকে বেড়াতে…'

পয়েন্টম্যানজী ডেকে বলে, 'করমা। বাবুকে বল্ কল বাজছে।'

তোর বৌয়ের খুব সুখ হবে। করমার বৌ ! ওয়ারিশ গঞ্জ ইস্টিশান·· মগধী ডোমেদের তাঁবু···উঠতি বয়সের ছুঁড়ি নাকে নথ। নথে জমে থাকা কালো ময়লা। হলদে দাঁতে মিশি !

করমা আপন হাতে তৈরী লুচি হালুয়া ঐ ছুঁড়িকে খাওয়াতে পারেনি। একদিন কাগজের ঠোঙায় করে নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ও ঘামে একেবারে ভিজে উঠেছিল। ওর সাহসই হয়নি। যদি ঐ ছুঁড়ি চেঁচাতে শুরু করে—তুই আমায় লুকিয়ে চুরিয়ে হালুয়া কেন খাওয়াচ্ছিস ? ও, দাদা—আ—আ—আ !

বাবু হাজার বলুক, করমার মন কখনও জানতে চায় না যে ওর বাড়ী সাঁওতাল পরগণা, নাকি রাঁচির দিকে কোথাও। মনিহারী ঘাটে দু-দুবার থেকে এসেছে, ও। ওপারে সাহেবগঞ্জ-কাজয়োটিয়ার

পাহাড় ওকে টানেনি, কখনও। অথচ, ওয়ারিসগঞ্জ, কদমপুরা, কালুচক, লাখপতিয়ার—নাম শুনলেই ওর ভেতরে কিছু একটা টনটন করে ওঠে। জানা-শোনা, অচেনা কত লোকের মুখ ভিড় করে আসে! কতো কথা—সুখ-দুঃখের! ক্ষেত-খামার, গাছ-পালা নদী পুকুর, চড়ুই-ময়না সব একযোগে টানে, করমাকে!

সাতদিন ধরে, ঐ জঙ্গলের কালো তালগাছ ওকে ইশারায় ডাকে। জঙ্গলের ওপর আকাশে উড়ে বেড়ানো চিল এসে করমাকে কেন ডেকে যায়? কেন?

'রেলওয়ে হাতা' পেরনোর পরেও যখন কুকুরটা ফিরে গেল না, করমা তখন ধমক দেয়, 'তুই কোথায় যাবি শালা? যেখানে যাস ঘেঁউ ঘেঁউ করে কুকুর তাড়া করে। যা। পালা। পালা!'

কুকুরটা থমকে করমাকে দেখতে থাকে। ধানক্ষেতের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে যাওয়া নয়ানজুলি ধরে করমা হাঁটতে থাকে, ধানের শিষ এখনও ফুটে রেরোয়নি। হেডকোয়াটারে বড়বাবুর গর্ভবতী বৌয়ের কথা মনে পড়ে করমার। শুনেছে, ডাক্তার ভিতরের ফটো তুলে দেখেছে—জমজ বাচ্চা আছে পেটে।

এদিকে 'হস্ত নক্ষত্র' ভালো জল দিয়েছে। ক্ষেতে এখনও জল জমে রয়েছে। একি মাছ?

জলে মাগুর মাছ দেখে করমার শরীর আপনা থেকে স্থির হয়ে পড়ে। নিশ্বাস চেপে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে ক্ষেতের আলের ওপর যায়। মাছ লাফায়। আয়নার মত স্থির জলে হঠাৎ নাচতে শুরু করে। করমা এখন কি করবে? ওদিককার আল ঘেঁষে একটা আড়া দিয়ে যদি জল ছেঁকে ফেলা যায়?

হেই হেই—হেই হেই! শালা। বুনো শেয়াল, পালাবি কোথায়? আরো লাফা! আরে, কাঁটা করমাকে কি আর কৌটবি? করমা নতুন শিকারী নয়।

আটটা মাগুর আর একটা ল্যাটা মাছ! সবকটা কালো মাছ!

কাটিহারের হাটে এর দাম বে-ওজন তিনটাকা নিয়ে নেয়। করমা গামছায় মাছ কটা বেঁধে নেয়। এমন তৃপ্তি ওর কখনও হয়নি, এর আগে। অনেক মাছ ধরেছে ও।

একটা বুড়ো মোষঅলার দেখা পায়, মোষ খুঁজতে বেরিয়েছে, 'ও ভাই। ওদিকে কোনও মোষ নজরে পড়েছে?'

মোষঅলা করমার কাছ থেকে একটা বিড়ি চায়। ওর আশ্চর্য লাগে—কেমন লোক হে, না বিড়ি খায়, না তামাক! ওকে রাগ করে জেরা করতে শুরু করে, 'এদিকে কোথায় যাবে? গাঁয়ে তোমার কে আছে? মাছ কোথায় নিয়ে যাচ্ছো?'

তালগাছ ক্রমশঃ পেছনে সরে যায়। করমা দেখে, গাঁ এসে গেছে। গাঁয়ে কোথাও ভেলকিঅলা এসেছে। বাচ্চারা দৌড়চ্ছে, হ্যাঁ, ভাল্লুক নাচ বটে। ডুগডুগির আওয়াজ শুনেই করমা বুঝে ফেলেছে।

গাঁয়েব প্রথম গন্ধ। গন্ধের প্রথম আভাস।

গাঁয়ের প্রথম লোক। একজন বুড়ো জল দিচ্ছে কপিক্ষেতে। চুল তাঁর সাদা ধবধবে, অথচ জল দেয়ার সময় বাহুতে যৌবন ঝলসে উঠছে। ওমা, এ যে সেই বুড়ো সেদিন বেগুন 'বুক' করতে গিয়েছিল, সেখানে করমার সঙ্গে ভাব জমিয়ে গল্প করতে চাইছিল! করমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল—মা-বাপ নেই? নাকি, মা-বাপকে ছেড়ে পালিয়ে এসেছো? সেও করমাকে চিনে ফেলেছে।

'কি ভাই? এদিকে কোথায়?'

'এমনিই। বেড়াতে বেড়াতে। আপনার বাড়ী বুঝি এই গাঁয়ে?'

বুড়ো হাসে। ঘন গোঁফ জোড়া ছড়িয়ে পড়ে। বুড়ো ঠিক সত্যবাবু টিটি'র বাবার মত হাসে।

লাল সাড়ী পরা একটি মেয়ে হুঁকোর ওপর কলকে বসিয়ে ফুঁ দিতে দিতে এগিয়ে আসে। কলকেয় ফুঁ দেয়ার সময় ওর গাল জোড়া ফুলে ওঠে। করমাকে দেখে থমকে পড়ে। তারপর

কপিক্ষেতের সীমা ডিঙোয়। বুড়ো বলে, 'যা বিটি, দেউড়িতে আমরা যাচ্ছি।'

বুড়ো হাত-পা ধুয়ে ক্ষেতের বাইরে আসে, 'চলো।'

মেয়েটি জিজ্ঞেস করে, 'বাবা, এ কে?'

'ভালুকঅলা।'

'ধেৎ।'

করমা লজ্জা পায়! ওর চেহারা-টেহারা কি ভালুকঅলার মতো? বুড়ো জিজ্ঞেস করে, 'তুমি তো রিলীফবাবুর চাকর? তাই না!'

'না, চাকর নই। এমনি সঙ্গে থাকি।'

'এমনিই? সঙ্গে? কতো মাইনে পাও?'

'সঙ্গে থাকলে কি আর মাইনে পাওয়া যায়?

বুড়ো হুঁকো টানতে ভুলে যায়। বলে, 'শুধু-শুধু? বে-মতলব তাবেদার?

অন্দরের দিকে মুখ করে বুড়ো বলে, 'সরসতিয়া! মাকে পাঠিয়ে দে তো, এখানে। এক অদ্ভুত লোক!'

বুড়ী বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে! বুড়ো বলে, 'দেখো একবার, এই কেঠো জোয়ানকে! পেটভাতায় কাজ করে। কি হে, কাপড়চোপড় পাও নাকি? হুঁ একেই বলে পেটমাখোরাম মরদ!'

অন্দরে একটি মিহি খিলখিল হাসি। ভালুকঅলা কাছেপিঠে হয়তো কোথাও তামাশা দেখাচ্ছে। ডুগডুগির তালে ভালুক হাত নেড়ে-নেড়ে থপ্-থপ্ করে হয়তো নাচছে—থুতনি উঁচু করে। আচ্ছা, ভোলারাম, নাচ দারুণ হয়েছে তোমার। এবার একবারটি দেখিয়ে দেতো কুঁড়ে বৌ কোলে বাচ্চা শুইয়ে রেখে কেমন করে ঢুলতে শুরু করে। বাহ্ ভোলারাম!

একগাদা খিলখিল হাসি!

'তোমার নাম কি হে? করমচান? বাহ্, নামটা তো বেশ সৌভাগ্যের। কিন্তু কাজ? কাজ কি চুলোচান?'

করমা লজ্জা পেয়ে কথা ঘুরিয়ে দেয়, 'আপনার ক্ষেতের বেগুন খুব ভালো। একেবারে মাখনের মতো। বুড়ো হাসতে থাকে।

এবার বুড়ীর হাসি করমার শরীরে প্রাণ ফিরিয়ে নেয়। তিনি বললেন, 'বেচারাকে একটু দম নিতে দাও তো। সেই তখন থেকে পেছনে লেগেছো।

'মাছ বুঝি? বাবুর জন্য নিয়ে যাচ্ছ?'

'না। এমনিই রাস্তার ধারে।'

'সরসতিয়ার মা! অতিথিকে চিঁড়ে ভেজে মাছভাজার সঙ্গে খাওয়াও। একদিন না হয় অন্যের হাতের ভাজা মাছ খাও হে।'

জলপান করার সময় করমা শুনতে পায়—কেউ একজন জিজ্ঞেস করছে, 'এই, সরসতিয়ার মা! কোথাকার অতিথি?'

'কাটিহারের।'

'কে?'

'কুটুম।'

'কাটিহারে আবার তোমার কুটুম কবে হলো?'

'সবে হয়েছে।'

আবার একটা খিলখিল হাসি! একগুচ্ছ খিলখিল হাসি! কলকেতে ফুঁ দেয়ার সময়ে সরসতিয়ার গালজোড়া মুসম্বীলেবুর মতো গোল হয়ে পড়ে। বুড়ি স্নেহভরা কণ্ঠে জিজ্ঞেস করে—'হ্যাঁগো বাছা! তারের ভেতর দিয়ে মানুষের গলার আওয়াজ যায় কি করে? আমায় একটু খোলসা করে বুঝিয়ে দাও তো।'

ফিরে আসার সময় বুড়ী ধীর স্বরে বলে, 'বুড়োর কথায় যেন রাগ করো না। জোয়ান ছেলে যাবার পর থেকে, এমন সব উল্টো-পাল্টা কথা বলে বুকের ঘা।'

'আবার এসো।'

'নিজের বাড়ী মনে করো।'

ফেরার সময় করমার মনে হয়, তিনজোড়া চোখ ওর পিঠে স্থির হয়ে আছে। চোখ নয়—ডেস্টিন সিংগল, হোম সিংগল আর পয়েন্ট সিংগলের লাল-লাল গোলাকার আলো!

যে ক্ষেতে করমা মাছ ধরেছিল, তার আলের ওপর একটা ঢোঁড়া সাপ শুয়ে আছে। ফোঁস ফোঁস করতে করতে পালায়। ওমা! কুকুরটা এখনও ওর পথ চেয়ে বসে আছে। খুশীর চোটে নাচতে শুরু করে করমাকে দেখে।

রেল হাতায় এসে করমার মনে হয়, বুড়ো ওকে বোকা বানিয়ে ঠকিয়ে নিয়েছে। তিন টাকার—বড়বড় মাগুর মাছ এক মুঠো চিঁড়ে খাইয়ে, চারটে মিঠে-মিঠে কথা বলে···

মাছের কথা করমা পেটে সেঁধিয়ে রাখে। কিন্তু বাবু যে আগে জেনে ফেলা 'আগরজানি' লোক। দু হাত দূর থেকেই বললেন, 'করমা, তোর গা থেকে যে কাঁচা মাছের গন্ধ আসছে। মাছ নিয়ে এসেছিস বুঝি ?

করমা এখন কি জবাব দেবে? জীবনে প্রথমবার কোনবাবুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে। মাছ দেখে বাবু নিশ্চয়ই নাচতে শুরু করতেন।

পনরো দিন দেখতে দেখতে কেটে যায়।

আজ রাতের গাড়ীতে ইস্টিশানের 'সামটন' মাষ্টারবাবু এসেছেন ছেলেপেলেসহ। পনরো দিন নিস্তব্ধ ফ্যামিলী কোয়াটারে এখন হৈ চৈ ছেয়ে আছে। ভোরের গাড়ীতেই করমা তার বাবুর সঙ্গে হেডকোয়াটারে ফিরে যাবে। এরপর মনিহারী ঘাট।

না আজ রাতেও করমার চোখে ঘুম আসবে না। না, এখন বার্নিশ-চুণের গন্ধ পাচ্ছে না। বাবু মজা করে ঘুমোচ্ছেন। বাবু সত্যি-সত্যি গোপালবাবুর মতো। কোন জায়গার প্রতি এক তিল মোহ নেই, মায়াও নেই। করমা কি করবে? এমন তো

কখনও হয়নি। আবার এসো। নিজের বাড়ী মনে করো। কুটুম পেটমাধোরাম মরদ!

সহসা করমা এক অদ্ভুত ধরনের গন্ধ পায়। সে উঠে বসে। কোথেকে এ গন্ধ আসছে? সে ধীরে ধীরে প্লাটফর্ম পেরিয়ে যায়। চুপচাপ ঘ্রাণ নিতে নিতে এগোতে থাকে। রেল লাইনের ওপর পা পড়তেই সব কটা সিংগল-হোম, ডিসটিন, ও পয়েন্ট—জোরে জোরে বিউগুল বাজতে থাকে! ফ্যামিলী কোয়াটার থেকে একজন মহিলা চেঁচিয়ে ওঠে, 'চো-ও-ও-র!' ও পালায়। একটা ইঞ্জিন ওর পেছন পেছন দৌড়ে আসছে। মগধী ডোমের ছুঁড়ি? তাঁবুতে ও লুকিয়ে পড়ে। সরসতিয়া খিলখিল করে হেসে ওঠে। ওর ঝাঁকড়া চুল, অস্নাত দেহের গন্ধ, করমার বুকে প্রবেশ করে। ভয় পেয়ে সরসতিয়ার কোলে···না, ওর বুড়ীমার কোলে মুখ লুকিয়ে ফেলে। রেল আর জাহাজের ভোঁ একসঙ্গে বেজে ওঠে। সিংগলের লাল-লাল আলো ··

'করমা ওঠ! এ্যাই করমা, জিনিষপত্তর বাইরে বার কর।'

করমা একটা গন্ধের সমুদ্রে ডুবে আছে। ও উঠে জামা পরে। বাবুর বাক্স বাইরে আনে। পানি-পাঁড়ে—'কহা শুনা মাফ্ করনা' বলে। করমা তবুও ডুবে থাকে।

গাড়ী আসে। বাবু গাড়ীতে উঠে বসেন। করমা বাক্স তুলে দেয়। ও সারভেন্ট কেলাসে বসবে। বাবু জিজ্ঞেস করেন, 'সবকিছু তুলে দিয়েছিস তো? কিছু পড়ে থাকে নি?' না, কিছু পড়ে নেই। গাড়ীর বাঁশী বাজে। করমা দেখে, প্লাটফর্মে বসে থাকা কুকুরটা ওর দিকে তাকিয়ে কুঁই কুঁই করছে, অস্থির হয়ে উঠছে কুকুরটা!

'বাবু!'

'কি হলো?'

'আমি যাবো না!' করমা চলন্ত গাড়ী থেকে নেমে পড়ে। মাটিতে পা দিতেই হোঁচট খায়। কিন্তু সামলে নেয়।

তিন বিন্দু



গীতালি দাস নিজেকে সুরজীবিনী বলে। নাদ-সুরতাল ইত্যাদির সাহায্যে সে আজ এই উঁচু স্থানে পৌঁছুতে পেরেছে। সবাই বলে, তার সাধনা সফল হয়েছে। কী সরল ও সিধে এই লোকসকল! সাধনায় সফল-অসফল হওয়া ঘোষণাকারীদের কাছে সে জিজ্ঞেস করতে চায়, সফল সাধনার সোজা অর্থ কি! এটা ঠিক, বহু অ-সঙ্গীতিক পরিবেশকে গীতালি তার সোনালী সুর ও সুগম গীতে সঙ্গীতময় করে তুলেছে, যে-কোন সঙ্গীত-অনুষ্ঠান বা সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তারা আজও গীতালির নামে সঙ্গীত-প্রেমিকদের জড়ো করে ফেলেন! কিন্তু, আর কতদিন? গীতালি'দির সফল সাধনার কি হলো? গীতালি তার বড়দি মিতালির ভুলের সুযোগ নিয়েছে।

বিশুদ্ধ (?) ঠুংরি-গায়িকা মিতালির সফল জীবনের মাত্র চব্বিশ মাসের সামনে নিজের সুর-জীবনের 'রোল' করা—পরিপাটি করে গোটানো—অংশটুকু খোলে, ধীরে ধীরে! ন বছর? একশ আট মাস কম নয়!

গীতালি আজকাল প্রায় নিজের মনে উদ্ভূত সহায়ক নাদের বিশ্লেষণ করে। সহায়ক নাদ। যাকে ওভারটোন বলে। নাদ কখনও একা উৎপন্ন হয় না। তার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নাদের জন্ম হয়। সেই স্বর আমরা শুনতে পাই বা না পাই, কিন্তু মূল নাদ থেকে উদ্ভূত এই নাদকে 'সহায়ক' নাদ বলা হয়। স্বয়ং জন্ম নেয়া দরুণ একে 'স্বয়ম্ভু স্বর' ও বলা হয়। গীতালি এই স্বরের সহায়তায় সিদ্ধি এবং খ্যাতি লাভ করে; প্রার্থনার সুরে অনবরত বাজতে থাকা জীবনের সুর-তালের সীমা থেকে কখনও সে বাইরে যায় নি। সীমা-বিস্তার করেছে, অবশ্য। কিন্তু এদিকে কয়েকদিন ধরে তার জন্ম

করছে। গান গাইবার সময়, মূর্ত হয়ে ওঠা রাগ এক-আধবার অস্পষ্টতরও হয়ে পড়েছে।

হুঁ-হুঁ-হুঁ-হুঁহুঁ···

জীবন একটি প্রার্থনা-আ সঙ্গীতের ম-তো-ও!

এই জীবনের কিছু অংশ কেটে নেয় গীতালি, টুকরো-টুকরো করে, পিষে ফেলে। তারপর, চূর্ণ-বিচূর্ণ মুহূর্তের সুর-কনিকাগুলোকে সহায়ক নাদের সাহায্যে পরখ করে। ডট-ডট-ডট! গীতালি এই খুদে-খুদে তিনটে ফুটকি, চোখের সামনে শূণ্যে ফুটে ওঠা ছোট-ছোট নক্ষত্র-তারা, এখন ভালো দৃষ্টিতে দেখছে; চেনে এই শুভ চিহ্ন!

গীতালি সুরজীবনী, কিন্তু সাহিত্যজগতের সাধনা এবং প্রগতির সামান্য খবরা-খবর রাখে। তার জামাইবাবু নিজেকে সুযোগের অপেক্ষায় বসে থাকা কোনদিন বিখ্যাত হয়ে ওঠা, প্রচ্ছন্ন সমালোচক মনে করেন। টাইম-বোমা! টাইম-বোমা না আলুবোমা! গরম গরম আলুরচপ প্লেটে করে জামাইবাবুর ঘরে ঢুকেছিল সে। সুদর্শনা-অদর্শনাও সঙ্গে ছিল। দুষ্টুমিভরা হাসি চেপে গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করতে করতে গীতালি বলেছিল—দেখুন জামাইবাবু, এ হলো আলুর বোমা, মানে বোম। আলুসেদ্দর কোলে কাঁচা ছোলা বন্ধ আছে। বিশুদ্ধ ঘিয়ে ভাজা এই অবিস্ফোটক বোমা—ফাটার নয়, বরং জুড়নোর সময় উপস্থিত হয়ে এসেছে। এতক্ষণ ধরে এরাও আলুর রূপে তাক করে বসে ছিল।

শয়তান সুদর্শনা মুখ বেঁকিয়ে বলেছিল—না-না আলু বলো না। জামাইবাবু সুযোগ পেলেই ঝাঁপিয়ে পড়া হিংস্র প্রাণী হয়ে পড়েন। শিকার সামনে এলেই অমনি। হো-হো-হো! জামাইবাবুও হেসেছিলেন। কিন্তু দিদির খারাপ লেগেছিল। যাই হোক, জামাইবাবুর বই কেনার বিচিত্র অভ্যেসের কারণে গীতালি এবং তার বান্ধবী সুদর্শনা-অদর্শনাও খুব লাভান্বিত হয়েছিল। কথাসাহিত্যের ভাল-মন্দ বই পড়তে পেত।

আধুনিক কথা-সাহিত্যে ডট-বাদীদেরও একটা দল আছে। ডট-ডট-ডট। এখনো ওঠেনি, কিন্তু যে কোনদিন এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে এমন ডটময়ী রচনাবলীর রচয়িতাদের মগজে শুধু ডট-ই নেই তো! মগজের জায়গায়, মাছের অসংখ্য ডিমের থলি নেই তো? অধিকাংশ সাধারণ পাঠক অবশ্য এমন বিন্দু-ফোঁটাধারী রচনাবলী সু-নজরে দেখে না। গোটা বইয়ে, প্রতিটি পৃষ্ঠা এবং পংক্তিতে যত্র-তত্র সরষের দানার মত ছড়ানো ফুট্‌কির বাহুল্যে পাঠকদের চোখ কির কির করে!

গীতালি এই ফুট্‌কিগুলোকে অলখ-মুখর জগতের জানালা মনে করে, তিনটে গোল লাল কাঁচের। ভেতরে আলো। অলখ মুখর জগতের ক্রিয়া-কলাপ শুরু হয়।

তিন ফুটকির সাহায্যে অপ্রাসঙ্গিক প্রসঙ্গ এবং অসংলগ্ন মুহূর্ত-কে রূপায়িত করানো, অন্য জগতের হাল্কা ছবি দেখানো, পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানো,—এমন কোন শব্দ-শিল্পীর সঙ্গে যদি কখনও দেখা হয়, গীতালি বলবে—স্বীকার করো আর না-ই করো; এগুলো কিন্তু সহায়ক নাদের চিহ্ন! জিজ্ঞেস করবে, এই ওভারটোন বা সহায়ক নাদের সৃষ্টি আপনা-আপনি হয় না? মনের অসংখ্য জানালা দিয়ে উঁকি মারা মুখ কি নিজেই কথা বলে না? কথা-ই কথা বলবে, আমি নয়। রহস্যের জট খুলবে কথা-ই। কোনো শিল্পীর জবাব গীতালির মনে-মনে কোন পাখী আউড়ে চলেছে!

গীতালির সহসা মিস্ত্রী হারাধন যন্ত্রকারের কথা মনে পড়ে। বেশ কিছু মুখ ভেসে ওঠা মিলিয়ে যাবার পর ডট-ডট-ডট! তারপর মিস্ত্রী হারাধন যন্ত্রকারের একটি তৈলচিত্র ঝুলে থাকে তার মনের দেয়ালে। কে জানে যন্ত্রকারমশাই এখন কোথায়! গীতালি তার হাতদুটো জোড় করে শূন্যে এক নমস্কার জানায়।

জীবনের ইতস্ততঃ ঝঙ্কৃত সহায়ক নাদের প্রথম সাক্ষাৎ পরিচয় মিস্ত্রী হারাধন যন্ত্রকার-ই করিয়ে দিয়েছিলেন। মিস্ত্রী নয়, গুরু বলে,

মান্য করে হারাধন যন্ত্রকারকে। যন্ত্রকারমশাই'র মন্ত্র-বলেই সে গীত-পাগল হয়ে উঠেছিল। জানিস খুকী, পাকা শিকারী হতে গেলে সব ধরনের শিকারীদের কাছে দীক্ষা নিতে হয়; বাঘ-ভাল্লুক শিকারী থেকে শুরু করে ব্যাধ এবং সাপুড়েদের সঙ্গতও করতে হয়। যন্ত্রকার বলো, মিস্ত্রী বলো বা কারিগরই বলো, তুমি আমার নাতনীর বয়সী! দাতুর কথা শুনবে? যন্ত্রের সাহায্যেই তুমি সহায়ক নাদের পাঁচ হাজার আন্দোলন যুক্ত ধ্বনির সুক্ষ্মতা উপভোগ করতে পারবে। সদা ধ্বনিত জানা অজানা সুরে তোমার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মুখরিত হয়ে উঠবে।

অলখ-মুখর জগতে দশ বছর পূর্বেকার কথা মুখরিত হয়ে চলেছে!

সুর-মন্দিরের ম্যানেজারকে কটু কথা বলতে বাধ্য হয়ে ছিল গীতালি। শহরের সবচেয়ে পুরনো ও নির্ভরযোগ্য বাদ্যযন্ত্রের দোকানের এই অবস্থা! একই সপ্তাহে তিনবার তানপুরা সারিয়ে নিয়ে গেছে, তবুও যেই-কে-সেই! গানের মাঝপথেই বিযুক্ত হয়ে পড়ে। রোগ কি, এ বলে দেয়ার বিশেষজ্ঞ নেই আপনার কাছে? তাহলে এটাকে সুর-মন্দির বলবো, নাকি অসুর-মন্দির? ম্যানেজারের মুখ প্রাণহীন মাইকের মত গোল খোলা থাকে। গীতালি তানপুরা নিয়ে সুর-মন্দিরের সিঁড়ি বেয়ে নেবে যায়, আর কখনও না আসার প্রতিজ্ঞা করতে করতে। এক-দুই-তিন।

—ও দিদি, শুনুন শুনুন।—কিছুটা দূর যাবার পর, পেছন থেকে ডাক শুনে গীতালি ফিরে দাঁড়ায়। একটা বেঁটে-খাটো, গোল-গাল ছেলে গড়াতে-গড়াতে আসে ফুটপাথে। কে এই, বিদঘুটে ছোকরা? ছেলেটা কাছে এসে নমস্কার করে—আপনি গীতালি দি? তাই না? হেঁ-হেঁ, হেঁ-হেঁ, তানপুরা শুধু নয়, সুর-মন্দিরে সব বাদ্যযন্ত্রের গলা এভাবে টিপে ফেলা হয়। যেদিন থেকে মিস্ত্রী হারাধন যন্ত্রকার সুর-মন্দিরকে সেলাম জানিয়ে বেরিয়ে এসেছে, সব কটি অসুর থেকে গেছে! আপনি ঠিকই বলেছেন গীতালি'দি!

গীতালি দেখে, ছেলেটি অকাল-পরিপক্ক নয়, কোন গ্রন্থি বিকারের ফলে এমন। বামন নয়, বেঁটে ও দাড়ি-গোঁফ হীন—ঘুঘলু। ও নিজের নাম বলে—ঘুঘলু। আসামের দিকে কোথাও জন্মেছে। মিস্ত্রী হারাধন যন্ত্রকারের সঙ্গে গত পনরো-কুড়ি বছর ধরে আছে। কলকাতায় সাত-আট বছর, দু-তিন বছর এদিক-ওদিক, আর এখানেও প্রায় পাঁচ-সাত বছর হলো।

ঘুঘলু জানায়, মিস্ত্রী হারাধন যন্ত্রকার আজকাল কারো দোকানে কাজ করে না ; নিজের গলি থেকে বাইরে কোথাও যাতায়াত করে না। গলিই বা বলি কেন, নিজের ঘর ছেড়ে বাইরে বেরুবার ফুরসৎ নেই। ঘুঘলু কয়েকজন নতুন-পুরনো যন্ত্রবাদকের নামোচ্চারণ করে ; যাদের দরকার পড়ে মিস্ত্রী হারাধন যন্ত্রকারকে খোঁজ করে এখানে এসে হাজির হয়, কলকাতা থেকে, লখনৌ থেকে, কাশী থেকে।

গীতালি তক্ষুনি রাজী হয়ে পড়ে। ঘুঘলু রিক্সাঅলাকে ডাকে—এ্যাই রিক্সাঅলা, দুধকুপ মহল্লা যাবে ?

দুধকুপ মহল্লার একটা গলিতে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে ঘুঘলু একটা খাপরা ঘরের কাছে দাঁড়ায়। বন্ধ দরজার একটা ফুটোয় চোখ এঁটে ভেতরের বাতাবরণের আন্দাজ করে। তারপর শিকল নাড়াতে থাকে। ভেতর থেকে কারো খনখনে শব্দ বন্ধ দরজার ফুটো দিয়ে শোনা যায়। ভেতরের লোকটিকে বহু প্রশ্নের উত্তর দিয়ে কিছুটা সন্তুষ্ট করে ঘুঘলু। তবে গিয়ে দরজা খোলে। মনে হয়, ভেতরে কেউ নিজের ঘর থেকে দড়ি টেনে ছিটকিনি খুলে দেয়। ঘুঘলু ভেতরে ঢোকে। একটা কর্কশ ঝাঁঝি শোনা যায়—কোত্থেকে আবার কাকে জুটিয়েছিস ?

ঘুঘলুর চাপা স্বরে স্পষ্ট ধরা পড়ে সে অনুনয় করে বলছে—মাস্টার, আপনি না বলবেন না। তার সমস্ত চেষ্টা-চরিত্র একেবারে ভেস্তে যাবে।

বাইরে দাঁড়ানো গীতালি, ঘুঘলুর এরকম ঘ্যানঘ্যান করাটা ভাল

লাগে না। কিন্তু, বেসুরো যন্ত্রটাকে নিয়ে সে কি রেয়াজ করতে পারবে। তাই সে চুপ করে থাকে। তারপর, একজন অপ্রসন্ন আত্মা ও বিকৃত চেহারার মাঝবয়সী লোক দরজা দিয়ে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করে—কি হয়েছে? সুর-মন্দিরঅলারা তেরোটা বাজিয়ে দিয়েছে যন্ত্রের! রেখে যাও, তিন দিন পরে এসো। বাঃ, এর খোলটা তো বড় বাহারী। যন্ত্রটার যত্ন-টত্ন নাও, না কি?

গীতালি চমৎকৃত হয়েছিল হারাধন যন্ত্রকারের কথাবার্তা শুনে। সাধা স্বরে, অর্থহীন কোন ঝংকার কর্কশতা সৃষ্টি করছে। সে চুপ করেই থাকে। যন্ত্রকার কিছুক্ষণ গীতালির মুদ্রা পাঠ করার চেষ্টা করে। তারপর বলে—কিন্তু-কিংবা নিয়ে কিসের মাথা ঘামাচ্ছো, খুকি? যন্ত্রকারের সুর কোমল হয়—বেসুরো কে সুরেলা করা দশ মিনিটের কাজ নয়। এসো, ভেতরে এসো!

হারাধনের ঘরে ঢুকে গীতালি খুশী হয়। দেয়ালে গ্রামাফোন রেকর্ড কোম্পানী দ্বারা প্রচারিত ভারত-প্রসিদ্ধ শিল্পীদের ছবি ঝুলছে। এক-আধটা প্রশংসাপত্র অথবা সার্টিফিকেট জাতীয় জিনিষও রয়েছে! মেঝেয় নানা ধরণের বাদ্যযন্ত্র ছড়িয়ে আছে। রেডিয়োয় যন্ত্রী-সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে সরোদ বাদন চলছে। অকরাম। উদীয়মান সরোদবাদক অকরাম, স্বরচিত গৎ 'অর্চনা বোল' উপস্থাপন করছে। থেকে-থেকে সরোদের তার থেকে শঙ্খ এবং ঘণ্টাধ্বনি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। হারাধন যন্ত্রকার তার ছোট পুরনো সেটের দিকে আঙুল তুলে বলে—শুনছো? সাত বছর হলো অকরামের এই সরোদ। আজও যেমন-কে-তেমন আছে। যন্ত্রের যত্ন মানে যন্ত্রের পূজো!

হারাধন সেতার, সরোদ, সুরবাহার, দিল রুবা, বীণা এসব প্রসিদ্ধ বাদ্যযন্ত্রের নাম বলে। গীতালি স্বীকার করে, পাঁচ মিনিটের পরিচয়ে যন্ত্রকারের কথায় বিশ্বাস করতে পারেনি। যন্ত্রকার তা বুঝে ফেলেছিল। সে তার অ্যাটাচী থেকে কয়েকখানা নতুন-পুরনো চিঠি বার করে গীতালির সামনে তুলে ধরে বলেছিল পড়ে দ্যাখো।

কলকাতা থেকে ভারত প্রসিদ্ধ (স্বর্গীয়) সেতার বাদক ওস্তাদ কাদের হুসেনের আন্তরিকতায় ভরা একটা চিঠি পাঁচ বছর আগেকার: ভাই হারাধন, তুমি তো সত্যি-সত্যি হারা ধন হয়ে পড়েছো আমার কাছে। আমার যন্ত্রে কিছু একটা ঘটেছে, যার-তার হাতে দেয়ার সাহস হয় না। জানি, তুমি কলকাতায় আসবে না। আমিই যাচ্ছি তোমার কাছে।

রেডিয়োয় তখন যোগেন্দ্র সুরীর বেহালা হেমন্তের রাগ-বিস্তারের প্রস্তুতি চলছে। কে বলে যন্ত্র প্রাণহীন হয়!

গীতালি মুগ্ধ হতে থাকে। ছোট-বড় সুর-শিল্পী এবং ওস্তাদের প্রিয় পত্রাবলি, অকরামের 'অর্চনা বোল', যোগেন্দ্র সুরীর বেহালা, ঘুঘলুর গুরুভক্তি,—সব কিছু মিলে গীতালির সামনে মিস্ত্রী হারাধন যন্ত্রকারের আত্মার প্রকৃত ছবি উপস্থিত করে।

ঘুঘলু স্টোভ ধরিয়ে চা তৈরী করতে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে সে নিজের ওস্তাদের কথায় বোতাম টেপার মত নিজের মতামত টিঁকে দেয়—মহাদেবলাল তবলচী মানুষ নন, একেবারে খাঁটি হীরে। খাঁ সাহেব তো দাতাপীর; পকেট থেকে মুঠোভরা টাকা বের করে 'পরবী' দিতেন। মুন্নু সারেঙ্গিয়া আমার ওপর ভয়ানক রেগে আছেন সেদিন থেকে।

ঘুঘলু চা দিয়ে যায়। চায়ের প্রথম চুমুক দেবার পর হারাধন যন্ত্রকার বলে—যন্ত্রকার বা কারিগরই বলো, বেসুরো কেউ বলতে পারবে না। এখন নিজের কর্মফল ভোগ করছি, খুকি। প্রাণহীন কাঠ, তার শুকনো চামড়ায় সুর চাপিয়ে জীবন কাটানো ছাড়া আর কি গতি আছে এখন? অভিশপ্ত জীবন কাটাচ্ছি। তুমি আমার নাতনীর বয়সী। বিশ্বাস করবে, আমিও এককালে গাইতাম? আমার আওয়াজ শুনে হরিণের দল ছুটে আসত।

যন্ত্রকার আবার তার অ্যাটাচীর ঢাকনা তোলে। কিছু একটা খুঁজতে-খুঁজতে বলে—আমি জানি, তুমি বিশ্বাস করবে না। তোমাকে

সব খুলে বলতে হবে। জীয়ন্দপুর এস্টেটের রাজা জীবৎস নারায়ণ দেবজ্যুর নাম শুনেছো? শিকারের অভিজ্ঞতা নিয়ে একখানা মোটা প্রসিদ্ধ বই লিখেছেন ইংরেজীতে। তাতে দেখো—পাবলিক লাইব্রেরীতে আছে সেই বই—দেখেবে, বারো, বাইশ, চল্লিশ এবং পঞ্চান্ন পাতায় আমার উল্লেখ আছে। গ্রুপ ফটোতে আমায় দেখে এখন কেউ আর চিনতে পারবে না! রাজা সাহেব শিকার ছাড়া সঙ্গীত চর্চাও করতেন। তাঁর শিকার পার্টিতে জেফরী কর্ডাইট ·৩৩৩ বোর রাইফেলের সঙ্গে সেতারের প্রয়োজন হতো। তিন-চারজন বড় ওস্তাদ এবং ডজন খানিক শিষ্য তাঁর দরবারে প্রতিপালিত হত। আমার গুরু পণ্ডিত শিববালক ঝা সেই দরবারের গায়ক ছিলেন।

গীতালি ঘড়ি দেখে। ঘুঘলু এবার এক গেলাসে চা করে আনে। বলে—এই কাহিনী বলার সময় আমার ওস্তাদ এসপেশাল চা খায়।

পকেট থেকে একটা ময়লা রুমাল বার করে গেলাস জড়িয়ে ধরে যন্ত্রকার গীতালিকে দেখে—খুকী, তোমার দেরী হয়ে যাবে। অন্য কোনদিন তোমায় শোনাবো কি করে হরিণের দল ছুটে আসত।

গীতালি হেসে ওঠে—অর্ধেক গল্প শুনলে আমার আবার অর্ধেক মাথায় যন্ত্রণা হয়।

শুনলে, নাকি শোনালে? যাই হোক, আমি নিশ্চিন্ত হলাম। মাথা-যন্ত্রণায় ভয় পাবে মাথাঅলারা। আমি পেটঅলা লোক!

গীতালি আবার হেসে ফেলে। যখনি গীতালি হাসে, যন্ত্রকারের ডান কানপটির কাছে চামড়া নাচতে থাকে। কোঁচকানো বিকৃত চেহারায় এক বিচিত্র চমক্ ছেয়ে পড়ে।

তাহলে শোনো।

সেবার গুরুদেব কৃপাদৃষ্টি দেন হারাধনের দিকে। শিকার পার্টির সঙ্গে যাবার আদেশ দিলেন। এখন, জঙ্গলে মঙ্গল করার কত আর গল্প শোনাবে হারাধন! লিখলে পরে একটা মোটা বই তৈরী হয়ে পড়বে। রাজা সাহেব প্রকৃত শিকারী ছিলেন।

নেপালের তরাইয়ে মধুমারা জঙ্গলে কিরাত-সরদার 'চিতল' শিকার করে দেখিয়েছিল। তরাইয়ের জঙ্গলের মাঝে সামান্য খোলা জায়গা, যাকে ইংরেজীতে গ্লেড' বলে! জ্যোৎস্না যেখানে লম্বা-লম্বা শালগাছের ডগায় ঝুলে থাকে না, শ্যামল-মসৃণ ঘাসের ওপর বিছিয়ে পড়ে। পাশেই বয়ে চলে পাহাড়ী নদী, যা কলকল-কুলকুল শব্দ করে না। বাতাস ফিসফিস করে কথা বলে। চৈত্রের জ্যোৎস্না। আলোয় এক ঠুঁটো গাছ বিস্ময়ের মত দাঁড়িয়ে আছে। ছায়ায় কেউ ইশারায় কিছু বলে, এবং গোটা তরাইয়ে, তরাইয়ের জঙ্গলে একটা ডাক প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। কামাতুরা হরিণীর ডাক! নদীর শীতল জলে তৃষ্ণা মেটাতে গিয়ে চিতলের মন-প্রাণে অন্য এক তৃষ্ণা জ্বলে ওঠে দপদপিয়ে। হরিণী থেকে থেকে ডেকে ওঠে। জ্যোৎস্নায় নর-চিতলের দল দেখা যায়। প্রতিটি চিতলের শরীরের চাকতি দাগ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। জ্যোৎস্নায় স্থির ঠুঁটো বিস্ময়ে অথবা আবেশে কাঁপতে থাকে। ছায়ায় আবার কেউ ইশারা করে—সিস্-সিস্! তারপর জ্যোৎস্নায় তীরের ঝিলিক খচ্ খচ্!

তারপর, মৃত প্রেমিকের লাশ থেকে নিজেদের তীর বার করে কিরাতের দল নাচতে থাকে—হা-হিরা-হা-হিরা-হা-হির্-র্-র্-র্-র- !

একটা মাদী-চিতলকে শৈশব থেকে পালন করে নকল ডাক ডাকার ভাল করে তালিম দেয়া হয়। ওস্তাদ গলার নীচে আঙুল দিয়ে সুড়সুড়ি দেয়, আর হরিণী সময় অসময় ডেকে ওঠে।

এই শিকার দেখার ফলে রাজা সাহেব অসুস্থ হয়ে পড়েন। জানা নেই, উনি এই পদ্ধতিতে পরে কোন শিকার করেছেন কিনা, কিন্তু হারাধনের মাথায় এই শিকারের ভূত চেপে বসে। কামান্ধ চিতলের চিৎকার, ছটফটানি এবং নিঃশ্বাস বন্ধ হওয়া দেখে তার ভেতরের কিরাত আনন্দে খিলখিল করে ওঠে! সঙ্গীত-সাধনা ছেড়ে-ছুড়ে হারাধন কিরাত সরদারের সাথে পালিয়ে যায়।

প্রতি বছর চৈত্রের জ্যোৎস্না রাতে তিন-চার বার এই শিকার

হয়। শিক্ষিতা মাদী চিতলের সঙ্গে তার শিক্ষককেও পুজো করে কিরাতেরা। এমন হরিণী খুবই দামী এবং অলভ্য বলে মনে করা হয়। সারা বছর হরিণের শুকনো মাংস আগুনে পুড়িয়ে খাওয়ার সময় প্রতিটি কিরাত হা-হিরা বলে তাকে স্মরণ করে। সেবার তিন-চারটে শিকারে হারাধন কিরাতদের সঙ্গে থাকে। বছরখানেক কিরাতদের সঙ্গে থেকেও সে মাদী চিতলকে শিক্ষা দেয়ার রহস্য শিখতে পারেনি। এক নম্বর পাহাড়ের যত পাহাড়ি-গাঁ ছিল, সেই সব গাঁয়ে মাত্র একটাই মাদী চিতল ছিল, এবং তার মালিকই ছিল একমাত্র গুণী। মূলধন হরিণী!

কিন্তু, হারাধন এই মূলধন সস্তা করে ফেলে, নিজের সাধনায়। মাদী চিতলের দরকারই বা কি? হারাধন কামাতুরা মাদী চিতলের মত ডাকতে পারে। কিরাত সরদার পরীক্ষার জন্য শিকারের আয়োজন করে। চৈত্রের জ্যোৎস্নাই বা কেন, যখন ইচ্ছে শিকার করো। বারো মাস।

জ্যোৎস্না রাত। রাতের শেষ প্রহর। ব্রাহ্ম মুহূর্তে হারাধন প্রথমবার ডাকে—অবিকল নকল! চতরাগদ্দীর কাছে, কুশীনদীর ধারে শ্বেত-হরিৎ ভূমিতে ডজন-ডজন চিতল ছুটে আসে। খচ্‌চ্‌-খচ্‌চ্‌।

হারাধনের পুজো হতে থাকে, এক নম্বর পাহাড়ে। এলাকার সবচেয়ে সুন্দরী রমনী তার সেবায় নিয়োজীত হয়। কিরাত-সরদার তার প্রাণের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। সেবার ভীষণ ভূমিকম্প হয় ১৯৩৪ জানুয়ারী। ভূমিকম্পের তৃতীয় দিনে সকল কিরাত স্বীকার করে—এই দৈব কোপ হারাধনের জন্যই ঘটেছে।

ভগবতীর কৃপা! নারীর কৃপায় তার প্রাণ রক্ষে পায়। মৃগচর্ম বগল দাবা করে গুরুর সেবায় উপস্থিত হয়। গুরুর সামনে, রাজা সাহেবের বাগীচায় বসে নিজের কণ্ঠের শিল্প প্রস্তুত করে এক নতুন বিপদের সৃষ্টি করে ফেলে সে। সেবার চিতল শিকার দেখে

রাজাসাহেব কোন মানসিক রোগের শিকার হয়ে পড়েছিলেন। অনেকদিন ধরে চিকিৎসা করার পর কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন, এমন সময় হারাধনের ডাক শোনা যায়। রাজাসাহেব আবার অসুস্থ হয়ে পড়েন। পুরনো শিকারী তিনি! আওয়াজ শোনার সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ করে ওঠেন—সেই যে, সেই মাদী চিতল, ছলনাময়ী হরিণী, ডাইনী, স্পটেড ডিয়ার, চিত্রা! এক্সপ্রেস ৫০০ রাইফেল হাতে নিয়ে শব্দ ভেদী নিশানা করে ফায়ার করেন। হারাধন তার ডাকের 'সম'-এ এসে সবে পৌছেছে, এমন সময় তার গুরু পণ্ডিত শিববালকের বুকে একটা সফট নোজড এক্সপ্যাণ্ডিং বুলেট এসে বিঁধে যায়। হারাধনের গুরু শিষ্যদ্বারা সমর্পিত মৃগচর্মের ওপর বসেছিলেন। চিতলের চামড়ায় আজও রক্তের দাগ লেগে আছে। হারাধন পালিয়ে যায়। যেখানেই যায়, এমনই অঘটন ঘটতে থাকে।

কানে হাত রেখে হারাধন চোখ বোজে। বলে—তখন থেকে, তারপর গলায় এক কর্কশ ধাতব শব্দ জেগেছে। আমি বানীকে কলঙ্কিত করেছি যে। সুর বাঁধার কাজ করতে থাকি। কিন্তু··· কিন্তু ··!

ঘুঘলু একটা পুরনো মৃগচর্ম নিয়ে আসে ভেতর থেকে। —এটা সেই চঞ্চল যুবা নর-চিতলের চামড়া, চার-চারটে তীর বুকে খেয়ে যে আমার কাছে ছুটে এসেছিল! আমার সামনে পা টান-টান ছড়িয়ে প্রাণ দিয়েছিল। গুরুজী এর ওপর বসেছিলেন, মুহূর্ত কয়েক!

হারাধন যন্ত্রকার মৃগচর্ম তুলে শ্রদ্ধা সহকারে মাথায় ছোঁয়ায়। তারপর গীতালির সামনে রেখে বলেছিল সেই স্বর্ণমৃগের কি নাম ছিল, মারীচ? সীতার মনে কেন ঐ মৃগচর্মের ওপর বসার বাসনা বা লালসা হলো? রামায়ণে কোথাও কি লেখা আছে কিছু? সম্ভবতঃ কোন সাধনা করার জন্যেই।

হারাধন যন্ত্রকার নেপালের তরাইয়ের শ্যামল বনভূমি, সেখানকার সবুজ-শ্যামল মায়াডোর দিয়ে নিজের কাহিনী বাঁধতে বাঁধতে বলে—

খুকী! নাতনিই বলবো এবার থেকে, দাদু বলে মানছো তো! ভালো, ভালো। কালও আসবে? খুব ভালো!

পরদিনও যায়, গীতালি। যন্ত্রকার দেখা হতেই গীতালির হাতের তালু দেখার ইচ্ছে প্রকাশ করে। গীতালি দু হাতের তালু খুলে ধরে। হুঁ-উ! তোমার দিদি মিতালি যা করতে পারেনি, তোমার দ্বারা তা সম্ভব। নিশ্চয়। গীতালি দেখে, যন্ত্রকার তার দিদির সঙ্গীত জীবনের ছোট-বড় কথা ছাড়া জীবনের ছোট-বড় ঘটনার সঙ্গেও বেশ পরিচিত। যন্ত্রকার বলেছিল—নাতনি, কিছু মনে করো না। তোমার দিদি ঐ টমাটোর মত মানুষটাকে বিয়ে করে সবকিছু নষ্ট করে ফেলেছে। আচ্ছা, এমন ছারপোকা দেখেছো কি, যে রক্ত চুষে লাল-গোল ফোঁটার মত হয়ে পড়ে? ছারপোকাই সে লোকটা! তোমার দিদির সব কিছু চুষে নিয়েছে। কি? সাহিত্যিক? সে আবার কোন্ আপদ?

কথাবার্তার মাঝে কখনও-কখনও যন্ত্রকার এমনই ছাড়া-ছাড়া কথা বলে। নিজের জামাইবাবুকে টমাটো এবং ছারপোকার সঙ্গে তুলনা শুনে একটুও দুঃখ হয় নি। সে সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ায়—ঠিকই বলছেন আপনি! আপদই বটে। দিদিও বেশ ভুগছে। তিলে-তিলে মরছে।

সঙ্গীত জগতে আগ্রহী লোকেরা অসময় বিলুপ্ত মিতালির প্রতিভার জন্য বিভিন্ন লোকেদের দোষী ঠাউরায়। কেউ তার গুরুর দোষ জানায়, কেউ তার অকাল-মাতৃত্বের দোহাই দেয়, কিন্তু মিতালির স্বামীর দিকে কেউ আঙুল তুলে দেখায় না যদিও দিদির জীবনে এই লোকটিই ঘুণ ধরিয়েছে। 'শুচিবায়ু' পবিত্রতার ভ্রম! জামাইবাবুর আবার 'বিশুদ্ধ' বলার মুদ্রাদোষ আছে। অশুদ্ধ? বিশুদ্ধ · সঙ্কুচিত মুখ ভঙ্গিমা! দিদি এখন বাথরুমেই গান গায়। হাতের আঙুলের-দিকে তালুর চামড়া সবসময় জলে ভিজে থাকার দরুণ কুঁচকে থাকে। সারাদিন কাপড় ধোয়।

ঘুঘলুও চেনে মিতালি'দিকে। কথায় ফোঁড়ন কাটতে-কাটতে বলে—যে আসরে মিতালি'দি প্রোগাম থাকতো, সেখানে ভিড়ে দু-একবার লাঠি-চালনা হতো। কি হলো শেষ পর্যন্ত?

হবে আর কি! তার স্বামী দেবতা সঙ্গীত শুনেই মুগ্ধ হয়েছিল। সঙ্গীতের মধ্যে ঠুংরি! মিতালি'দির ঠুংরিতে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, সে কারণে, ঐ সময়ে 'মিতালি-ঠুংরি' নামের একটি নতুন ধারা প্রচলিত হয়ে পড়েছিল। বিয়ের পর সর্বশিল্প-মর্মজ্ঞ স্বামী-দেবতা আদর করে বোঝায়—মিতালি রাণী, ঠুংরি গাইছো যখন, বিশুদ্ধ ঠুংরি গাও। স্বামীদেবতার ইচ্ছে! তারপর আর কি, দিদি তখন ধীরে ধীরে এক রাগ-বিশেষের আশ্রয়ে রেওয়াজ করতে থাকে। লখনৌ ও বেনারসের ঠুংরি নির্ভেজালভাবে শোনাতে থাকে। গুরুজী নিষেধ করেছিলেন। উনি মিতালি'দির স্বামীকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন—ঠুংরিকে আঞ্চলিক সঙ্গীতের প্রভাবই এযাবৎকাল পুষ্ট করেছে! খেয়ালের অনুগামিনীই স্রেফ নয়, গ্রাম্য সুরে সমন্বিত ঠুংরি, ওস্তাদ বড়ে।

—বড় বড় ওস্তাদের বড়বড় বুকনি শোনাবেন না পণ্ডিতজী! আমি ঠুংরির ইতিহাস জানি। প্রশ্ন হলো বিশুদ্ধতার! ঠুংরির নামে বর্ণসংকর জিনিস শিক্ষাদাতাদের আমি সঙ্গীতজ্ঞ মনে করিনা!

মিতালি'দি দাঁড়িয়ে গুরুদেবের অপদস্থ দেখতে থাকে। কিছু বলে না!

এতদিন মিবালি'দি কাফি বা খাম্বাজের ঠুংরিতে কখনও কীর্তন, কখনও ভাটিয়ালি, আবার কখনও পুরবীর ছোঁয়া দিত। তার প্রসিদ্ধির একমাত্র রহস্যই ছিল এটা। মূল রাগের সঙ্গে লুকোচুরি খেলতে খেলতে ছোট-ছোট, আঞ্চলিক রাগিনী অজান্তে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে ফেলত। মিতালি'দি নির্দয় ভাবে সেটা পরিত্যাগ করে। 'কি সকাল-সকাল বাজুবন্ধ খুলি-খুলি জায়ে, খুলি-খুলি জায়ে', মিতালি রাণী! বন্ধ করো, ভগবানের দোহাই। ঠুংরি বহুরূপী!

যে বেসেণ্ট-হলে তার প্রতিভার উদয় হয়েছিল, সেই মঞ্চে অস্তও হলো, গীতালি কি করে ভুলতে পারে সেই রাত! সেদিন গীতালির বাড়ীতে শোক ছেয়েছিল। গুরুজী ডুকরে ডুকরে কাঁদছিলেন শারদোৎসব সঙ্গীত সমারোহে মিতালি'দি আলাপের অঙ্গ সম্পূর্ণ করতে পারেনি তার আগেই হলে কুকুর বেড়ালের ডাক প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। নানান ধরণের মন্তব্য—মেটারনিটি সেণ্টারে পাঠাও! কনডেম্ড মাল!

তিন দিনের ক্ষুধার্ত-তৃষ্ণার্ত-পরাজিত গুরুজীর সামনে গীতালি প্রতিজ্ঞা করেছিল। সেদিনই গীত-ব্রত ধারণ করেছিল গীতালি। সরল-সুগম-সহজ-সঙ্গীতকে স্বাধীন মর্যাদা দেবে! মিতালি'দির পরিত্যক্তা রাগিনীকে উদারভাবে আশ্রয় দেয় সে।

রেডিয়োয় সংবাদ প্রচার হতে গীতালির সময়ের খেয়াল হয়। সে চুপ করে বসে যন্ত্রকারের কাজ করা দেখছিল। যন্ত্রকার চোখ বুজে বসে পড়ে! সংবাদ শোনার সময় সে এরকম আসন করে বসে থাকে। 'বিশাল বিশ্ব-যন্ত্র স্পর্শ করার সুখ অনুভব করি, সংবাদ শোনার সময়। বুঝলে নাতিন!'

এরপর ঘুঘলু রেডিয়ো বন্ধ করে দেয়। গীতালির তানপুরা কোলে নিয়ে যন্ত্রকার বলে—দেখেছো, এতে শুধু চারটে তার। কিন্তু এই চারটে তার থেকে সাতটি স্বর উৎপন্ন হয়। তোমার দিদি সহায়ক নাদের উপেক্ষা করেছিল। তুমি কিন্তু এমন করো না, সৌভাগ্য যে, তোমার যন্ত্রটি উত্তম।

এরপর গীতালির তানপুরা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। 'পা' স্বরে বাঁধা তারে 'ধা নি রে' সহায়ক নাদের রূপে ঝংকৃত হবে। 'সা রে গা পা' কেন? এটাই সঙ্গে নিয়ে তুমি কিনা নিখিল ভারত সুর-সঙ্গম-সমারোহে অংশ নিতে যাচ্ছিলে? রাধে-রাধে!

রাধেশ্যামের কথা মনে পড়ে গীতালির, রাধে গীটারিস্ট! যে প্রতিভা বিকশিত হবার আগে শেষ হয়ে পড়ে, তার জন্য কার না

দুঃখ হয়? পাঁচরঙা জ্যাকেট আর তরোয়ালছাঁট গোঁফ! সে সময় গীতালির বাড়ীতে ঘনঘন যাতায়াত ছিল। গীতালির কয়েকটা গানের সঙ্গে সে সঙ্গতও করেছিল। সেদিন যন্ত্রকারের ওখান থেকে ফিরে এসে রাধেশ্যামকে প্রতীক্ষায় বসে থাকতে দেখে, কখন থেকে। মা রামকৃষ্ণ আশ্রমে কীর্তন শুনতে গিয়েছিল। রাধেশ্যাম! রাধেশ্যামের চেহারা সে ভাল করে দেখে। যন্ত্রকারের কথনানুসারে প্রতিটি শিল্পীর মুখ-মণ্ডলের চারপাশে সুর-তরঙ্গ কাঁপতে থাকে। সিম্ফনী কনসার্টের কণ্ডাক্টর মিস্টার র‍্যাঙ্কিন কে প্রথমবার দেখেই হারাধন যন্ত্রকার তার চেহারার আশে-পাশে বয়ে যাওয়া সুর-তরঙ্গ দেখেছিল। 'সি' মাইনর থেকে 'ঈ' ফ্ল্যাট পিয়ানো, হর্ণ, ওবো ক্লারিওনেট!

রাধেশ্যামের মুখ-মণ্ডলের পাশে অসুর-তরঙ্গ বয়ে চলেছিল। সে গিলে একেবারে চুর। গীতালির নৈঃশব্দের ভুল অর্থ মনে করে সে জড়ানো কণ্ঠস্বরে বলেছিল—ডা-র্লি! ডি-ড্-ডি-ডি-ডি-ডা-ডি-ডা-ডি-ডা-আ-আ! গী-টা-লী মাই গিটা-আ-। অকরামের 'অর্চনাবোল', শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি, ধূপ-গন্ধ—রাধেশ্যামের ঘষা-জড়ানো কথা এবং মদের গন্ধ! গীতালির সর্বকনিষ্ঠ ভাইয়ের বয়স হবে এই রাধেশ্যামের।

এত সাহস এর! গীতালি চুপচাপ ভেতরে চলে গেছিল।

রাধেশ্যামের পেছু ছাড়িয়ে উঠতে জামাইবাবুর এক বন্ধুর আবির্ভাব ঘটে। গীতিকার। জামাইবাবুর শিষ্য। সে গীতালির জীবনের সমস্ত গানের ঠিকে নেয়ার কথা শুরু করে। চাইলে দিনে পাঁচটা মধুর গীত রচনা করে দেখিয়ে দেবো। তুমি-গানের লাইনে-লাইনে তিনটে ফুট্‌কির মত ছড়িয়ে আছো, সজনী-ঈ, সজনী-ঈ, তুমি!

রাধেশ্যাম এক-আধটা ফিল্মী সুর সম্বল করে এখন বেঁচে আছে। জামাইবাবুর গীতিকার শিষ্যের কোন সজনীর সাক্ষাৎ ঘটে গিয়ে থাকবে!

নিঃসঙ্গ গীতালী ! একা গীত রচনা করে, সুর দেয়, গান গায়। দশ বছর ধরে গাইছে। যন্ত্রকার আরেকটা কথা বলেছিল গন্ধ ! গানে· গন্ধের পরিবেশন করতে পারো, এমন সাধনা করো !

তৃতীয় দিনে যন্ত্রকারের মুড ভাল ছিল না। ঘুঘলু বাইরে। গীতালি চুপচাপ ঘরের কোণে গিয়ে বসে পড়ে। নিখিল ভারত সুরসঙ্গম সমারোহের অন্তিম দিনের ঘোষণা করেছে। গীতালি যন্ত্রকার কে বলে দাত্ব, আশীর্বাদ করুন ! আমন্ত্রণ পেয়েছি।

ঘুঘলু একটা ঠোঙ্গায় ঘুঘনি আর কচুরি নিয়ে আসে। দেখার সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রকারের মুড সুধরে যায়। ভেতর থেকে গীতালির তানপুরা নিয়ে আসে ঘুঘলু। বাহারী খোল থেকে বার করে গীতালির দিকে এগিয়ে দেয় যন্ত্রকার, নাও ! সেরে গেছে। সবাইকে শুধরে দেবে। এর পূজো না করলেও, সম্মান নিশ্চয়ই করবে !

গীতালি আঙুল দিয়ে তারের স্পর্শ নেয়। হারাধন যন্ত্রকার এদিক-ওদিক দেখে বলে, আমার একটা কথা রাখবে ? তোমার আঙুল ছুঁতে দেবে ? হ্যাঁ-হ্যাঁ, নাতনী বড় আশ্চর্য হচ্ছে এ দেখে যে বুড়োর কি স্বভাব রে, কখনও তালু দেখতে চায়, কখনও আঙুল ছুঁতে চায়। হো-হো গীতালির আঙুলগুলি সে নিজের মাথায় ছুঁইয়ে বলে—আমার ভয় ছিল, তোমার নখ কাটার ধরণ ভুল নয়তো ! আঙুল ধরে-ই হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, কি নাতনী ? মনে মনে কি বাজছে ? কি বলছে মন ? কোন্ সুরে ?

সেদিন গীতালি হেসে জবাব দিয়েছিল, কই, কোন অচিন রাগিনী, বাজছে না তো ! কিন্তু আজ ? আজ সে স্পষ্ট শুনছে এমন এক রাগিনী, যাকে সে বাঁধতে পারে না। তার যন্ত্র হারে না, সে হারতে থাকে। কোথায় গেল যন্ত্রকার ? আছে, নাকি ?

সেবার নিখিল ভারত সুর-সঙ্গম সমারোহে সর্বোচ্চ স্থান পাবার পরেই দাত্ব হারাধন যন্ত্রকার কে প্রণাম করতে গিয়েছিল ! শুনে সে অবাক হয়, ঘুঘলুসহ হারাধণ যন্ত্রকার ফেরার। সুর-মন্দিরঅলারা

যন্ত্রপাতি এবং অনেক জিনিষের চুরির বদনাম দিয়ে রিপোর্ট করেছে।

তার পর, দশ বছর কেটে গেছে। দাদু, আমি তোমাকে দাদুধন বলে ডাকবো। দাদুধন! তোমার মৃগ-চর্ম আমায় দাও। আমি তার ওপর বসে সাধনা করবো। করবে? করবে? ভয় নাই? এই অশুভ মৃগচর্মে তোমার কোন অশুভ যেন না ঘটে! মৃগচর্ম মাথায় ছুঁইয়ে, গীতালি এক পাশে রেখে দেয়। এর উপর বসে সে সাধনা করেছে। চিতল, চিত্রা চন্দনের চাকতি রক্তের ছোপ ডট-ডট-ডট!

দশ বছর পরে, আজ দাদু হারাধন যন্ত্রকারকে স্মরণ করার সময় মন ইমনের পদ-বিন্যাসের ব্যবহার করছে। গীতালি এখন নিজেকে একটা যন্ত্র মনে করে। কোন অচেনা আঙুল তাকে বাজিয়ে যায় বার বার! অলখ-মুখর-জগতের ক্রিয়াকলাপে বাধা পড়ে। তিনটে জ্বলন্ত ফুটকি নিভে যায়। দরজায় পিওন ডেকে চিঠি ফেলে যায়। কুমারী গীতালি দাস, 'গীতমহল'।

হে দেব! হে দেবী এ কী? স্বপ্ন নয় তো? এ কী সত্যি? এ যে ভারত প্রসিদ্ধ সেতার বাদক অকরামের প্রণয়-নিবেদন ভরা চিঠি! শঙ্খ-ঘন্টাধ্বনি ধূপ-গন্ধ! অর্চনা বোন! ললিতে! বিলম্বিত দ্রুত! এ কি করে সম্ভব হলো? দশ বছর ধরে লুকনো কথা ছড়িয়ে পড়ল কি করে! মা!

অকরামের চিঠিতেই স্বর! এর প্রতিটি পংক্তিতে ঝংকার। শঙ্খ এবং ঘণ্টাধ্বনির মাঝে অকবামের কণ্ঠস্বর শোনে গীতালি! চিরসঙ্গী তানপুরার সাহায্য নেয় সে। দু হাতে আঁকড়ে ধরে! চারটি তার বেয়ে অকরামের কণ্ঠস্বর প্রসারিত হয়! গীতালি! গীতালি আমি অকরাম। গত আট বছর ধরে শুনছি,—শুনছি কেন,—উপভোগ করছি তোমার গানের গন্ধ! ধান কুটতে কুটতে, যাঁতা ঘোরাতে ঘোরাতে, গরু চরাতে থাকা সুন্দরীদের গায়ের নোনা

গন্ধ, ধান-ক্ষেতের, পুকুরে ঘাটে জল ভরতে যাওয়া সুন্দরীদের আঁচলের গন্ধ, সুগন্ধ বনফুলের সুরভিময় গীতির গায়িকা আমার প্রাণ শক্তি তীব্র করে দিয়েছে। আমি গীত-গন্ধা এবং গীতালি-গঙ্গা নামে দুটো গৎ রচনা করেছি। সে দিন, তুমি কিন্তু কার্পণ্য করেছিলে, নাকি? এমনটি করো না। আমি তোমার কণ্ঠ থেকে এতাবধি অ-গাওয়া গানের অবতরণ করাবো। গীত-গন্ধা! আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করবো তোমার সঙ্গে···

এবং এই দ্বিতীয় চিঠিও বলে ওঠে ঝংকার শব্দে। হারিয়ে যাওয়া দাদুধন—হারাধন! ওগো নাতিন! শিব প্রসন্ন হয়েছে। চোখ খোলো। গত সপ্তাহে, তোমাকে শোনার পরেই আমার বাসায় ছুটে এসেছিল মাস্টার! তোমার নাতনীর হৃদয় ছোট হয়ে আসছে, নাকি হৃদয় লুকিয়ে রাখছে? কিন্তু তোমার দেয়া জিনিষের উত্তাপ তার শিরায় নেমে এসেছে। বিড়বিড় করতে থাকে মাস্টার। আজ তোমার নাতনী ফুল গাছের তলায় ঘড়া-ভর্তি মধু নিয়ে বসেছিল, গানের বইও সঙ্গে আছে কিন্তু কিন্তু অনেক কিন্তু বলে যায় কুন্তন ও ছটফট করছে নাতনী! কিগো, মনে কি বাজছে বসন্ত বাহার? সবই স্বয়ম্ভু নাদের কৃপা! জাতি বিচার? শিল্পীর আবার জাত? গ্রাম জাতি-বাদী-সংবাদী ইত্যাদি রাগ পরখ করার সময়!

তৃতীয় চিঠিখানা বোবা! গত তিন বছর ধরে প্রতিটি শুভ অবসরে শিল্পময় কার্ড এঁকে পাঠায় শিল্পী। রামকৃষ্ণ আশ্রমে বার্ষিক উৎসবে মণ্ডপ ও বেদী রচনা করে মনোহর রায় সকলের মন মুগ্ধ করে ফেলেছিল। গীতালি বেদীর ধারে ঘণ্টাখানেক চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। ক্ষমা করো মনোহর, গীতালি চিরঋণী থাকবে তোমার। তুমি চাইলে গীতালি তার সমস্ত রঙ উজাড় করে দিতে পারত। তুমি সেই সুযোগের দুরুপযোগ করনি। তিন বছর! তিন শূন্য, চুপচাপ রইলে তুমি, চিরকাল। শিল্পী! গীতালি সুরজীবিনী। দশ বছর

আগেই সে কারো সুরে বাঁধা পড়েছিল। তবুও, তুমি কিছু বলতে পারতে আজও তোমার চিঠি কিছু বলে না। অকরাম শব্দধ্বনি করছে। প্রিয়! অকরাম! প্রিয় অকরাম! তুমি কত বড় গুণী! তুমি কি করে সব জেনেছো! গন্ধ? মহরাজ, এ তোমারই কৃপার ফল। অর্চনার বোল শোনার সময় আমি যে ধূপের গন্ধ পেয়েছিলাম! তুমিই এই গন্ধ পরিবেশন করেছো প্রথমবার! তোমারই জিনিষ, তোমাকেই! নাও, আমি যন্ত্র! তোমারই! আমায় বাজাও, ধন্য করো।

গীতালি পাশে রাখা তানপুরার তার ছুঁয়ে ঝংকার তোলে। মূল নাদ থেকে এক'শ গুণ উঁচুতে সহায়ক নাদ উৎপন্ন হয়।

তুমি শুনে থাকবে অকরাম, দাদুধন ঘুঘলু ব্যাণ্ড পার্টিতে হর্ন বাজায়, তোমরা সবাই শুনেছো। গীতালি অকরামের গলায় গীতমালা পরিয়ে দিয়েছে! 'এ' মাইনরের তীব্র সুর 'এফ' মেজরের আনন্দোল্লাস!

গীতালি পরমহংস দেবকে প্রণাম করে। পরমহংস দেবের কথামৃত থেকে ধ্বনি বেরোয়—মানুষের মন যেন সরষের পুটুলি।

গীতালির চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরে পড়ে। কণ্ঠ দিয়ে এক অচিন রাগিনী ফুটে বেরোয়।

অলখ-মুখর-জগতে অকরামের পদধ্বনি শোনে গীতালি।

একটি অকাহিনীর চরিত্র



বিগত কয়েক বছর ধরে ক্রমাগত শোনা যেতে থাকে যে এখন 'কাহিনী' বলে আর পৃথিবীতে কিছু অবশিষ্ট নেই—আমারও বিশ্বাস হয়ে উঠছিল যে সত্যি কাহিনী মারা গেছে। আমাদের বর্তমান সমাজ 'কাহিনীহীন' হয়ে পড়েছে, হঠাৎ-ই। কোথাও কোন গৃহের কোণেও কাহিনী ঘটছে না। সকলেই অকাহিনীময় জীবন কোন জটিলতা বা দুঃখ ছাড়াই কাটাচ্ছে। ফলে, সমাজের সমস্ত গল্পকাররা বেকার হয়ে পড়ছে, হতে চলেছে। আমি এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে অকাহিনীর মোটামুটি পরিভাষা বুঝে ফেলি। বেকার গল্পকার বেকারীর সময় যা কিছু গড়ে, তাকেই 'অকাহিনী' বলা।

কিন্তু, এই রকম দুর্দিনে হঠাৎ একদিন ছোটেলালের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে এবং আমার সমস্ত বিভ্রান্তি দূর হয়। অর্থাৎ আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে কাহিনীর মৃত্যু সংবাদ মিথ্যা। ছোটেলালের প্রথম দর্শন এবং তার সম্ভাষণে আমি আশ্বস্ত হই—আমাদের সমাজ এখনও সম্পূর্ণ গল্পহীন হয়ে পড়ে নি। ছোটেলালের সমস্ত অস্তিত্বই আমার কাছে কাহিনীর সঙ্গে ওতপ্রোতযুক্ত মনে হয়। আজ্ঞে না, ছোটেলাল কোন গল্পকার নয়—শহরে হারিয়ে যাওয়া একজন গ্রাম্য-কাহিনী-চরিত্র সে। এবং যতদিন ছোটেলালের মত চরিত্র জীবিত থাকবে, কাহিনী মরে গিয়েও বেঁচে উঠবে।

ছোটেলালের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় গত বছরে—ঠিক শ্রাবণী পূর্ণিমার দিন, পানের দোকানে। সে বার বার পানঅলার নাম ধরে-ধরে তাড়াতাড়ি আট 'খিলী' মিঠা পান সাজাতে বলছিল—'অ্যাই ক্রিস্না! সাজা না ভাই!

শহরে এমন গৃহসেবকদের সাধারণ চরিত্রের সঙ্গে আমার সাধারণ পরিচয় আছে। তাই, তাকে প্রথম দর্শনেই চিনে ফেলি, এবং সেও আমার চেহারা-টেহারা ও কথাবার্তা শুনে বুঝে নিয়েছে—আমিও তার স্তরের জীব। কিন্তু, ছোটেলালকে চিনতে আমি ভুল করি—এটা আমি স্বীকার করছি। পানঅলা যখন রুক্ষ মেজাজে আগেকার বাকী-বকেয়া তাগাদা করে, সে এতটুকুও অপ্রতিভ হয় না। বলে—'মাইরি, বাকী-বকেয়া নিয়ে কি কেউ কেটে পড়ছে? আগে মুড়ে দে আটটা মিঠে পাতার।'

এমন অবস্থায় আমি সচরাচর কিছু বলি না। কিন্তু, সেদিন বলে বসি—'বাকী-বকেয়ার হিসেব নসিবের সঙ্গে করো। চাকরকে অযথা কথা শোনাচ্ছো···'

ছোটেলাল আঘাত খাওয়া প্রাণীর মত আমার এদিকে প্রত্যাক্রমণ করে—'একটু লোক চিনে কথা বলুন মশাই। এখানে কেউ কারো চাকর নয়।'

পানঅলা ছেলেটা বলে—'পরমেশ্বর বাবুর ছোট ভাই।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমা চাই—'মাফ করবেন ভাই!'

পান দোকানের গায়ে লাগানো একটা ছোট চায়ের দোকান আছে, যেখানে পাউরুটি এবং বিস্কুট ছাড়া সেদ্ধ ডিমও বিক্রি হয়। আমার সেইসব বন্ধু, যারা আমার কুকুরকে ভয় পায় অথবা যাদের কণ্ঠস্বর শুনে আমার কুকুর রেগে ঘেউ ঘেউ করে অথবা যারা তে-তলার সিঁড়ি ভাঙ্গতে অনভ্যস্ত কিংবা যাদের আমার ফ্লাটে নিয়ে যেতে অনিচ্ছুক—এই চায়ের দোকানে এনে 'চা-পান-সিগারেট ইত্যাদি' সহযোগে আপ্যায়ন করে তাদের অবাধ সম্ভাষণ শুনি।

ছোটেলাল আমার পা থেকে মাথা পর্যন্ত জরীপ করে জিজ্ঞেস করে—'আপনি মশায় কে?'

আমি নাম বলি এবং এও বলি যে তিন নম্বর রোডের একজন

উকিল সাহেবের ক্লার্ক। ছোটেলাল বলে—'সোজা মুহুরী বলতে লজ্জা করছে, তাই ক্লার্ক।'

ছোটেলাল আমায় আক্রমণ করে খুশী হয়। তারপর নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা করে বলে—শহরের সব ব্যাপারে ওপর চালাকী, দেখুন না—এই যে রাখীবন্ধন। গাঁয়ে 'সলোনী পুরণিমার' দিন।'

'সলোনী পূর্ণিমা?' অস্ফুট স্বরে আমি জিজ্ঞাসা করি। ছোটেলাল আমায় মহামুখ্যু মনে করে আমার ওপর কৃপাভঙ্গিমা করে—'সলোনী পুরণিমা জানেন না? আজই ত সলোনী পুরণিমা!

আমি আবার নিজের ভুলের জন্য ছোটেলালের কাছে ক্ষমা চাই—'ও? শ্রাবনী মানে শাঁওনী হ্যাঁ শাঁওনী পূর্ণিমার রাত 'সলোনী' হবেই।'

ছোটেলাল অজান্তেই আমাকে একটা সুন্দর পংক্তি দেয়—শাওনী সলোনী পূর্ণিমার রাত। মুখ থেকে বেরিয়ে পড়ে, 'বাহ্ ভাই!'

ছোটেলাল তার অসম্পূর্ণ বক্তব্যের সূত্র ধরে টানে—'তা, সলোনী পুরণিমার দিন গাঁয়ে 'বামুনরা' হাতে রঙ-বেরঙের রাখীর লাছি নিয়ে ঘরে-ঘরে ঘুরে বেড়িয়ে যজমানদের রাখী বাঁধে—'জৈন বন্ধু বলিরাজা' মন্ত্র পড়ে। কিন্তু শহরে রাখী—'ছুঁড়িরা' বাঁধে। আপন ভাইদের নয়—পাতানো দাদাদের!'

আমি আবার নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করি—'পাতানো দাদা?'

ছোটেলাল এবার আমায় করুণার দৃষ্টি হেনে, জিজ্ঞেস করে—'দাদা! আপনি কোন 'ডিস্টিক' এর লোক পাতানো দাদা বোঝেন না।'

বোঝানোর প্রয়োজন ছিল না। আমি তক্ষুণি বুঝে ফেলি। ছোটেলাল পানঅলাকে পানে বেশ করে মিষ্টি মশলা দেয়ার তাগাদা করে আবার শুরু করে—'দাদারও দুটো পাতানো বোন এসেছে—রাখী বাঁধতে।'

পান-অলা ক্রিস্না ফোড়ন কাটে—'তো, আপনার দাদার পাতানো বোন আপনারও পাতানো বোন হল।'

ছোটেলালের চেহারা টকটকে হয়ে ওঠে আবার—'মাইরি ক্রিস্না! তুইও একেবারে না-বুঝে কথা বলিস? দাদার পাতানো বোনের সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক? না তিনে, না তেরোয়। তার ওপর শহরের 'লপস্টিক মেয়েরা' হ্যাঁ দাদা, আপনার মুখ দেখে বুঝেছি আবার মানে জানতে চাইবেন—লপস্টিক মেয়ের মানে আপনাকে পরে কখনও বুঝিয়ে দেবো। মাইরি ক্রিস্না—সাজিয়ে দে, দেখছিস্ না এক ঘণ্টায় চারবার চা-বিস্কুট আর টৌফি-লেবেনচুষ নিতে এই মোড়ে এসেছি। এই দেখুন না—এই যে লেবেনচুষ। গাঁয়ে এটা ছেলে-ভোলানো মিঠাই, আর এখানে? এখানে এটা মেয়েদের—বিশেষ করে স্কুল-কলেজের মেয়েদের। বলছো এত তাড়া কিসের? আরে বাবা, এক্ষুনি আবার দুজনাকে পৌছে দিতে হবে। একজন থাকে ইরঘাট তো অন্যজন মীর ঘাট। বৌদি সাত সকালেই তার পাতানো দাদাকে রাখী বাঁধতে গেছে তা এখনও ফেরে নি। যদি, 'বিষ্টি-টিস্টিতে' কোথাও আটকে পড়ে, তাঁকেও খুঁজে নিয়ে আসার জন্য এই ছোটেলালকেই যেতে হবে। শহরে মেয়েদের পৌছনোর জন্য কোথাও যাওয়া যে কতখানি কঠিন কাজ—এই যে আরে, দাদা—পেছনে-পেছনে সাইকেলে রিক্সার সঙ্গে যাওয়া ঠাট্টা নয়! একদিন কোনো মেয়েকে পৌছিয়েই দেখুন না। এখানকার সবকটা চাকুমার ছেলেদের চিনে ফেলেছি কিন্তু, যাই বলুন—রাস্তা যাওয়ার সময় তারা মেয়েদের দিকে এমন সব 'শব্দভেদী বাণ' ছুড়ে দেয় যে মাঝে-মাঝে আমারও হাসি পায়।

'বিষ্টি-টিস্টি' শব্দ শুনে মন পুলকিত হয়। বোধ হয়, আকাশে গুমরে ওঠা কালো-কালো মেঘগুলোও প্রীত হয়—ছোট ছোট ফোঁটা পড়তে শুরু করে। আমরা সকলেই চা-অলার চালের নীচে—বেঞ্চে গিয়ে বসে পড়ি। ছোটেলাল অর্ডার দেয়—'তো, কর মাইরি, একটা ইশপেশাল চা।'

ছোটেলাল তারপর শহরের দুধ এবং দুধঅলা থেকে শুরু করে

গরুর নিন্দা করার পর নিজের গাঁয়ের দুধ এবং সেই দুধের সরের তুলনা 'ভাগলপুরী সিল্কের চাদরের' সঙ্গে করে। শুনে, চা-অলা আর থাকতে পারে না। সে চটে গিয়ে বলে—অমন মোটা সর ছেড়ে-ছুড়ে এখানে শহরের ঘেসো-ঘী খেতে এসেছো কেন? গাঁয়েই থাকতে!'

মনে হল, ছোটেলালের কাছে চা-অলার ধার-বাকী একটু বেশীই হবে, পানঅলার চেয়ে! কিন্তু, ছোটেলাল একটুও ছোট হয় না। চটে গিয়ে বলে—'এসেছি কি আর নিজের ইচ্ছেয়? নিজের ইচ্ছেয় তিন বছর আগে একবার গাঁ থেকে পালিয়ে এসেছিলাম। তা তিনদিনও থাকতে দেয়নি—দাদা-বৌদি। এখন ছোটেলালের দরকার পড়েছে, তাই পাঁচদিন ধরে খোশামোদ করে গাঁ থেকে ডেকে এনেছে।'

এই প্রসঙ্গে ছোটেলাল সবিস্তারে তার প্রফেসার দাদার শহরের 'লপস্টিক মেয়ের' সঙ্গে 'লটপটা' যাওয়া থেকে 'রেজেস্ট্রি বিয়ের' গপ্পো বলে ফেলে—উদার ভাবে। শেষে, 'ক্লাইমেক্সে' এসে গর্ব ভরে বলে—'আর, যেদিন থেকে এই বান্দা মানে ছোটেলাল এসেছে, সেদিন থেকে 'দুই প্রাণী' সুখে-নিশ্চিন্তে ঘুমোয়। দাদার অনুপস্থিতিতে এখন কোন 'মস্তান' আমাদের গলির ধার জানালার কাছে-পিঠে কোন 'মারকাটারি ফিল্মী গান' গাক ত দেখি! প্রথম-প্রথম এখানকার 'রংবাজ বাদশা'রা আমায় গেঁইয়া-ভূত ভেবে সিগারেটের ধোঁয়ায় উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু যখন ছোটেলাল একজন ফুটকিরিবাজের কব্জি ধরল কষে, অমনি শালা প্রথমে ঠিক সিনেমার 'ফাইটে'র মত কায়দা-নকশা দেখাল—পরে যখন ছোটেলালের প্রথম 'ঝাড়' পড়ল, অমনি সব শালা এমন পালালো তা, বলছিলে কেন এসেছো! না, আজকের দিন থেকেই, মানে সলোনী পুরনিমাঁর দিন থেকেই, 'ক্রিশ্না কুম্মার' মেলায় ড্রামার 'রিহালসল' শুরু হয়ে পড়ে। ওহ্! এবার, এখন কি যে হচ্ছে সেখানে?'

ছোটেলালকে গাঁয়ের স্মৃতিতে এমন ভাবে মগ্ন হতে দেখে আমি তাকে জাগিয়ে তুলি—'আপনি ড্রামায় কি করতেন ?'

আমার জিজ্ঞাসা সম্পূর্ণ হয় নি। তার পূর্বেই ছোটেলাল উত্তর দেয়—'কি করতাম না ? পর্দা-পোষাক জমা করা থেকে 'রিহলসল' এর জন্য সতরঞ্চি-জাজিম-হ্যাজাক-চা হালুয়া-সিদ্ধিগাঁজার ব্যবস্থা করা তাছাড়া, ড্রামাই হোক বা কুস্তি, বা ঘোড়দৌড়—ছোটেলাল ছাড়া হোক দেখি কোন কাজ ? ভাববেন না যে গাঁয়ে একেবারে গেঁইয়া ড্রামা হয়। আজ্ঞে না, একেবারে না। স্টেজে রীতিমত 'ফোকসিং' এর খেলা দেখানো হত—'বাগদাদের সওদাগর" তো কখনও 'সুলতানা ডাকু', বা ভগৎ সিংহ আর, সে কি খেলা—গুলাববাগ মেলায় আসা গ্রেট 'ঠেঠরিকালা কোম্পনী অফ ইণ্ডিয়া' ও একেবারে মাৎ! বুঝলেন ?'

প্রথম সাক্ষাতের পর থেকেই আমরা বন্ধু হয়ে পড়ি। ওর সঙ্গে গল্প করে সর্বদা কিছু নতুন শব্দ এবং প্রবাদ আমার প্রাপ্তি ঘটে। মাঝে-মাঝে একই সঙ্গে কতকগুলি কাহিনী—'সত্যি কাহিনী', নির্মিত কাহিনী' 'ধারাবাহিক কাহিনী! ছোটেলালও বুঝে ফেলেছে ওর 'দেহাতি মাল' নিয়ে 'শহুরে মসলার' আসল খদ্দের আমিই। কখনও চা, কখনও বিস্কুট কিংবা সেদ্ধ ডিম পেয়ে সে 'চটপটিদার' প্রেম-কাহিনী শোনাতে শুরু করে—আরে মশাই! গাঁয়ে যাকে 'লাটসাট' বা 'লটকে যাওয়া' বলে, ওকেই শহরে 'লব' কিংবা 'প্রেম' বলে···আমাদের ঝি টা···যার কাছে গাদাগাদা 'ভালবাসা মার্কা' গপ্পো-কেচ্ছা আছে। এই শহরের পঞ্চম রোডের পঞ্চাশটা 'ফেমিলী'র চাকর, ঝি আর জমাদার জমাদারনির সঙ্গে আমার জানাশোনা খাতির আছে! তা, রোজ তিন-চারটে, প্রেম-কাহিনী ঐ যে ছোট গাড়ীতে 'টেকো' বুড়ো এল একটু আগে—সে নিজের জমাদারনির সঙ্গে 'ঢলাঢলি' কি বললেন, বুড়ো ? আরে মশাই, মন কি কখনও বুড়ো হয় ঐ যে ছোঁড়াটাকে দেখছেন ঐ যে 'লেডিজ ফিঙ্গার' কিনছে—মাঝবয়সী মনিবিনীর 'খানকি' চাকর—খুব মজা

করছে—আমি ওকে কি বলি জানেন ? বৈশাখী শশার কচি ফালি! তিন নম্বরের লাল বাংলার ছাদে রোজ রাতে 'জ্যাস্তো সিনেমা' হয়। আর ঐ 'লব' করে বিয়ে বলুন কিংবা 'প্রেমবিবাহ'—আসলে হচ্ছে সব বালির দেয়াল। আমার বৌদিকেই দেখুন না—দাদার যে কজন বন্ধু আসে সকলে তাকে 'লব' এর চোখে দেখে। মানে, একবার একজনের সঙ্গে 'লব' করা মেয়েরা সবসময় কারু না কারুকে 'লব' করতেই থাকে—সকলে এটাই ধরে নেয়। আমারও এটাই অনুমান। পরে কোনদিন আপনাকে শোনাবো।'

কখনও তাকে বেশ উদাস দেখলে জিজ্ঞেস করি—'আজ তোমায় বড্ড উদাস দেখাচ্ছে ছোটে ? ব্যাপার কি ?'

সেদিন ক্রিস্নার খোঁচা এবং চটানোর পরেও সে কোন জবাব দেয় না। কিন্তু, আমার প্রশ্নের জবাবে সে প্রায় বলে থাকে—'ইচ্ছে করে, এখান থেকে উড়ে চলে যাই।'

'কোথায় ?' —আমি বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করি।

'কোথায় আবার ? গাঁয়ে।'

সাত-আট মাসের আড্ডায় আমি ওর দাদা বৌদি, গাঁ-ঘর পাড়া-সমাজের লোকজন ছাড়া তার গাঁয়ের আশেপাশে খেত-মাঠ, নদী-পুকুর, হাট-ঘাট-বাটের সঙ্গে ভালভাবে পরিচিত হয়ে পড়েছি। জিজ্ঞেস করি—'কেন ? রাণীগঞ্জ হাটের জিলিপি খেতে ইচ্ছে করছে, নাকি রজৌলী পুকুরের মাছ ?'

সেদিন, এমন মনে হল সে যেন আমারই প্রতীক্ষা করছে। বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞেস করতে সে আমায় চায়ের দোকানে নিয়ে যায়, হাত ধরে—'আপনি বলুন এবার আমি কি করি ? দাদা বৌদির ঝগড়া এখন চরমে গিয়ে ঠেকেছে। এখন মাঝেমাঝে মারামারি, ধ্বস্তাধ্বস্তি, আছাড় সব কিছু হয়। ওরা যখন ঝগড়া করে, আমি তখন রেডিয়োর আওয়াজ জোর করে দিই। জলের দুটো কল 'ফুল স্পীড' করে দিই, যাতে বাইরের লোকেরা—পাড়া-

প্রতিবেশীদের কাছে ওদের ঝগড়ার গলা যেন না পৌঁছয়। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা রাষ্ট্র হয়ে যাবে। এবার আমি করি? কার দিকে যাই? বৌদির মনে সন্দেহ দাদা কোন পাতানো-বোনের সঙ্গে 'লবে' লটকে গেছে, আর দাদা বলে শহুরে মেয়ে বিয়ে করে তার সুখ-শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। এখন যদি দাদার 'পক্ষ' নিই তাহলে বৌদি আর বৌদির হয়ে যদি বলি তাহলে দাদা—দুদিক থেকেই মারা পড়ি—দুজনেই আমার উপরে রাগ, অদ্ভুত সংকটে আমি ফেঁসে আছি। বলুন না, কি করি?'

আজ ছোটেলাল দারুণ খুশী। সে দাদার গৃহকলহ শান্ত করে দিয়েছে। দাদাকে আড়ালে ডেকে বলি—'বৌদির অনুপস্থিতিতে যদি কোন পাতানো-বোনকে ঘরে নিয়ে আসেন তাহলে বৌদিকে ধমক দিই—'বাপের বাড়ী যাবার অজুহাত করে আপনি এ পাড়ার মাসী ও-পাড়ার মামীর বাড়ী যাওয়া বন্ধ করুন, বৌদি! নইলে চেনা-রিক্সঅলাকে সাক্ষী এনে দাঁড় করাবো যে আপনি কোথায়-কোথায় যান, কার-কার সঙ্গে দেখা করেন।'

শেষে, সবচেয়ে বড় আনন্দের সংবাদটা দিতে গিয়ে লজ্জা পায়। তারপর হাসে—' আপনিই বলুন না, আমি কি করি? বৌদির এক মাসী আছে। তাঁর ছটা মেয়ে। কিন্তু চতুর্থজন ঠিক বৌদির মত দেখতে। বৌদিও ওকে খুব ভালবাসে। মাঝে মাঝে এসে দু-তিন দিন থেকেও যায়। তা আর কি বলব। নিজের ধারনা আমি বেশ সাবধানে থেকে এসেছি, এই শহরে। কিন্তু ঐ মেয়েটা না-জানি কেমন করে কবে থেকে আমাকে 'লব' করতে শুরু করেছে, সে আমায় চেয়ে বৌদিই আগে টের পেয়েছে। এখন বৌদি যে কি চায় আর বলবো কি? একেবারে, সরাসরি বিয়ে করতে বলছে। এবার আপনিই বলুন—আমি কি করি? যদি 'লব' করতে শুরু না করতো তাহলে পষ্ট বলে দিতুম যে শহরের লপস্টিক মেয়ে আমার পছন্দ নয়। কিন্তু, এখন একথা বললে ওর মন ভেঙ্গে যাবে। তাই না?



ভাতের হাঁড়ি থেকে সেদ্ধ আলু বার করে ছাড়াচ্ছিল গণপত, এমন সময় বাইরে কেউ খাঁখারি দিয়ে আগমনের সূচনা দেয়—সূচনা নয়, হুঁশিয়ারি। সে জিজ্ঞেস করে, 'কে?'

'কে ভেতরে? গণপত জী? অফিস অন্ধকার কেন? লণ্ঠন দিয়ে যান এদিকে।'

অবাক হয় গণপত। কমরেড বলরামজী পাটনা থেকে কখন ফিরলো? অন্যান্য কমরেডরা এখনও সভা থেকে ফেরেনি। বলরামজী কখন, কি ভাবে ফিরে এলো?

সে আলুরবাটি থালা দিয়ে ঢেকে রাখে, তারপর লণ্ঠন নিয়ে বাইরে আসে।

'লাল সেলাম, সাথী। বলুন, সভার কুশল-সংবাদ কি?'

বলরামের ঝুলে থাকা মুখ দেখে গণপতের উল্লসিত মন সহসা দমে যায়। বলরামের বিকৃত মুখ-মুদ্রা দেখে তার হৃদপিণ্ড কাঁপে—লক্ষণ ভালো নয়।

'একটু অফিস খুলুন।'

গণপত মনে-মনেই বলে, 'একটু কেন? পুরোটাই খুলে দিচ্ছি।' নাকমুখ এই ভাবে খিঁচিয়ে বলছে কেন? একবার পাটনা গেলেই সাথীদের না জানি কি হয়ে যায়।'

অফিস নামক ঝুপড়ির দরজা খুলে দেয়। কয়েকদিনের বন্ধ ঘর থেকে একটা গুমোট ভ্যাপসা গন্ধ বেরোয়। লণ্ঠনের আলো দু-তিনবার দপ্‌দপ্‌ করে কেঁপে ওঠে।

বলরামজী মুখখানি আরও বিকৃত করে বলে, 'লণ্ঠনে তেল আছে, নাকি জল? একটা চিমনি কিনে নেননি কেন?'

গণপতের ভাতের কথা মনে পড়ে। ঠাণ্ডা ভাত সে খেতে পারে না। খেলেই 'বায়ু' হয়। সে রান্নাঘরের কুপি জ্বালাতে জ্বালাতে বলে, 'তেল আর চিমনির কথা জানতে চাইছেন কমরেড, আগে আমায় খেয়ে নিতে দিন, তারপর সব জবাব দেবো। আপনি চা-টা যদি খেতে চান, বলুন, জল চাপিয়ে দিই। উনুনে আগুন আছে। পুরিয়ায় কিছু পাতা, কাগজীলেবুও আছে।'

উনুনের ওপর অ্যালুমিনিয়ামের কালিমাখা ডেকচি চাপিয়ে গণপত জ্বালানী ধকধকায়, তারপর আলু বার করে খোসা ছাড়াতে থাকে। আলু সেদ্ধ আর গরম গরম ভাত। গণপতের কাছে এর চেয়ে লোভনীয় পদার্থ এ সংসারে আর কিছু নেই। কুসমী মাঝে মাঝে বলে; 'ভাতখেকো মরদ'। গণপত হেসে জবাব দেয়, 'ভাতারখাকী!' বলরামজী 'খাঁখারি' দিয়ে সাবধান করে দিয়েছিল ঐ সময়। যদি সেসময় কুসমী ভেতরে থাকত, গণপতের চেহারা লাল হয়ে পড়ত এবং সে জোরে জোরে অকারণে কুসমীকে বকুনি দিত—'কাজ করার ইচ্ছে না থাকলে ছেড়ে দাও। যেমন তোমার ছেলে ফাঁকিবাজ, তেমনি তুমিও।' কুসমী হেসে ঘোমটার নীচে জবাব দিত···

আলুসেদ্ধ মাখার সময় গণপতের মনে পড়ে আজকের কাগজের খবর 'আমাদের জওয়ানরা শত্রুদের ট্যাঙ্ক সেদ্ধ করে দিয়েছে···'

তেল, পেঁয়াজ, লঙ্কা আর ধনেপাতার কুচি সেদ্ধ-আলুতে মেখে গোল-গোল পিণ্ড করে। পেতলের চকচকে থালায় ভাত ঢালার সময় ভাতের গন্ধ তার মন-প্রাণে মিশে যায়। ভাতের এই লোভনীয় গন্ধ সে প্রথম পায় সন ত্রিশে—স্বয়ংসেবক শিবিরে। তারপর থেকে আজ অবধি কত আশ্রম, কত শিবির কত সভা—সম্মেলন এবং জেলের সামূহিক ভোজনালয়ে গণপত পাতা এঁটো করেছে, কিন্তু এমন গন্ধ কি সব জায়গায়, সব দিন পাওয়া যায়?

তৃপ্তি সহকারে পেট ভরে খাওয়ার পর গণপত এঁটো থালা এঁটো

পাকের জায়গা ধুয়ে-মেজে পবিত্র করে। সকালে কুসমী এসে গোবর মাটি দিয়ে লেপে মুছে দেবে। সে চেঁচিয়ে ডাকে, 'শোভিতলাল! ভাত নিয়ে যা।'

কাঠের বাক্স থেকে পেয়ালা বার করে বলরামজীর জন্য লেবু-চা তৈরী করে গণপত। তারপর ভাজা মৌরীর দানা মুখে দিয়ে হাতে করে চায়ের পেয়ালা নিয়ে অফিস ঘরে যায়। মৌরীভাজা ছাড়া আর কোন রকমের নেশা নেই গণপতের। না বিড়ি-সিগারেট খায়, না পান-তামাক।

চায়ের প্রথম চুমুক দিতেই বলরামজীর বিকৃত মুখ সুশ্রী হয়ে পড়ে। চামড়ার ব্যাগে কাগজপত্র রাখতে রাখতে বলরামজী জিজ্ঞাসা করে, 'আপনি নিজে রান্না করেন কেন? শোভিতের মা কি করে?'

গণপত কুটভরা কথার মানে বোঝে। অর্থাৎ তিন টাকা মাইনে শোভিতকে আর পাঁচ টাকা মাইনে ওর মা কুসমীকে কোন কাজের জন্য দেয়া হচ্ছে?

বলরামজী আবার জিজ্ঞেস করে, 'তাহলে? এদিকে চাঁদা-টাদা কিছু আদায় হয়েছে, নাকি···'

গণপত ঢেকুর তুলতে-তুলতে বলে, 'সেটাই তো বলছিলুম, কমরেড ··'

বলরাম বাধা দেয়, 'আপনি এভাবে কথায়-কথায় কমরেড জুড়ে শুরু করেন কেন?'

'কমরেডকে কমরেড বলবো না তো কি বলবো? তাছাড়া এ তো আর নতুন নয়। ত্রিশ সালে, যেদিন থেকে পার্টির 'প্লেজ' নিয়েছি সেদিন থেকেই কমরেড···'

'সেদিনের কথা ছাড়ুন। আজকাল কেউ আর বলে না···আপনার কথা শুনে লোকেরা হাসে, এরি জন্য।'

'এতে হাসির কি আছে?'

'যাক্‌গে, ছাড়ুন ওকথা। আপনার সঙ্গে তর্কে কে পারবে? হ্যাঁ, চাঁদার ব্যাপারে কি যেন বলছিলেন?'

'বলার আর কি আছে। গত ছ'মাস ধরে সাহুর দোকানের বকেয়া বাড়তে-বাড়তে আড়াইশো পেঁাছেছে। জেলা সম্মেলনের সময় স্টেশানের মারোয়াড়ীর পঞ্চাশ টাকা বকেয়া এখনও শোধ হয়নি। পাটের সময় চাঁদার আশা ছিল। কিন্তু, দুর্ভিক্ষের সময় কে আর চায়, কেই বা দেয় চাঁদা? এখন ধানের মরশুম এসেছে, ওদিকে কমরেড-সাথীরা মাসভোর 'ফেরার' হয়ে আছে।···

বলরাম চমকে ওঠে—'ফেরার? কে ফেরার হয়েছে?'

গণপত মুচকি হেসে বলে, 'ফেরার' মানে সেই ফেরার নয়। মানে এখন সব কমরেডরাই এলাকার বাইরে।'

বলরামজী গম্ভীর হয়ে পড়ে। উঠতে উঠতে বলে, 'গণপতজী আপনি ঠিকই বলছেন। মনে হয়, সকলেই এখন ফেরার হয়ে পড়বে।'

'মানে?'

'মানে বুঝে আপনি করবেন কি! সেসব 'হাইলেভেল' আর 'নীতি-নির্ধারণের' লড়াইয়ের কথা আপনি কি বুঝবেন?'

গণপত আর কিছু বুঝুক না-বুঝুক, মানুষের মনের কথা পড়তে জানে। বলরামজীর কথায় এক বিশেষ ধরণের 'ঝাঁঝ' লাগে তার। ···আলুসেদ্দয় খারাপ তেলের গন্ধ!

হাইলেভেল। গণপত ইংরেজী লেখা-পড়া জানে না বটে, তাতে কি হয়েছে? বহু ইংরেজী শব্দের অর্থ সে বোঝে। ক্যাপিটালিস্ট, বুর্জোয়া, প্রলেতারিয়েত, কুলাক, রিঅ্যাকশনারী, গান্ধীয়াইট, পিশ পার্টি লিটারেচার, আরও অনেক শব্দ।

বলরামজী শুধু নয়, সবকটা 'নতুন কমরেড' গণপতকে এক কানাকড়ির মানুষ বলে মনে করে না। এখন যদি সাথী জিয়াউদ্দীন, কিংবা শৈলেন্দরজী কিংবা গোপালজী হতো, তাহলে কি সম্মেলন

থেকে বা মিটিং থেকে ফিরে এসে এভাবে মুখ ঝুলিয়ে ভ্রূ কাঁপিয়ে কথা বলে বাড়ী ফিরে যেত বৌয়ের সঙ্গে শোয়ার জন্য? অফিস সেক্রেটারী বলরামজীর যেদিন 'গা'ওনা' হয়েছে, সূর্য ডোবার আগেই অফিস বন্ধ করে বাড়ী পালিয়ে যায়।

এদিকে কয়েক বছর ধরে গণপতের মনে হয় চারদিকে এক দুর্ভাগ্য ঘন হয়ে ছেয়ে উঠেছে। কোথাও কারও মনে কোন ব্যাপারে উৎসাহ নেই। শেষাবধি এই রোগ গণপতের 'পার্টি'তে ধরল? এইবার জেলা কনফারেন্সে সে খোলা মনে এই সওয়াল পেশ করবে।

সে জানে, সওয়াল পেশ করার জন্য যেই উঠে দাঁড়াবে, অমনি যুব কমরেডরা আপসে ফিস্ ফিস্ করে হাসবে, কপট কাশি কাশবে, কেউ-কেউ চেঁচিয়ে বলবে, 'কমরেড গণপতি! এই সওয়াল কালচারাল প্রোগ্রামের সময় স্টেজে পেশ করবেন!'

'হুঁ। স্টেজে! স্টেজ'...

আঙুলে গোনার দরকার নেই। গণপতের সব কিছু গোনা আছে। পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে সে সর্বপ্রথম আর্যসমাজী সভা-মঞ্চে খঞ্জনি বাজিয়ে 'অচ্ছুতোদ্ধারের গীত' গাইবার জন্য উঠে দাঁড়িয়েছিল।

ঐ সভার কথা মনে পড়তেই পারবতিয়ার কথা মনে পড়ে যায়। যে হাতের জল খেলে জাত নষ্ট হয়, প্রেমে পড়ে গণপত নীচকুলের সেই পারবতিয়ার মুখে 'চুমু' খেয়েছিল। দিব্যি গেলেছিল সব কিছু ছিন্ন হোক, কিন্তু পারবতিয়াকে সে কখনও ছাড়বে না। জাতি সমাজ ছাড়াও বাড়ীর লোকেরা গণপতকে নানান ধরনের যাতনা দিয়েছিল। অবশেষে হেরে গিয়ে গণপত আর্যসমাজের মন্ত্রীর কাছে আবেদন করেছিল। কিন্তু ততদিনে পারবতিয়ার বাবা সপরিবারে গাঁ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

গণপত আর বাড়ী ফিরে যায় নি, গাঁয়েও নয়। মা-বাবা, ভাই-বোন, কুটুম-পরিবার, গাঁ-সমাজ সকলের সঙ্গে 'স্নেহ-সম্পর্ক ছিন্ন করে, দেশ ও দশের কাজে লেগে যায়। যেখানেই কোন সভা-টভা

হতো, গণপত সর্বপ্রথমে হাতে খঞ্জনি নিয়ে গান শুরু করে দিতো—হিন্দুরা মন দিয়ে শোনো. ভেবে দেখো—নিজের ভাইকে ঘৃণা…'

ত্রিশ সালে এই গান গাইবার অপরাধে ধরা পড়েছিল, জেলে গিয়েছিল, সাজাও হয়েছিল। সেবারে জেলেই শর্মাজীর কৃপায় কমরেড হয়ে গেছিল…

শরমাজী দাড়ি কাটা ব্লেড দিয়ে তার টিকি কেটে দিয়েছিল, আর পৈতে খুলে দিয়ে পাজামার ঘরে আটকে দিয়েছিল, 'আজ থেকে তুমি কমরেড গণপত। সিংহ-টিংহ কিছু নয়। শুধু কমরেড

মনে পড়ে, বাওনদাস আর চুন্নীদাস দুজনে মিলে গণপতকে কত ধিক্কার দিয়েছিল। কিন্তু সে এক চুলও নড়েনি। বরং বাওনদাসকে রাগাবার জন্য শরমাজীর শেখানো সওয়াল পেশ করেছিল—'বাওনদাসজী, চরখা চালালে আর ছাগলের দুধ খেলে স্বরাজ মিলবে কি ভাবে, একটু বুঝিয়ে দিন না।'

জেল থেকে বেরোবার পর গোটা জেলায় গণপত একমাত্র 'পার্টি কমরেড' ছিল কয়েক বছর ধরে। একই বছরে বিহার প্রদেশে বহু 'কিষান ফ্রণ্ট' এবং মজদুর-মোর্চায় হাজির হয়ে মেহনতী মজদুরের লড়াইয়ের সামিল হয়েছে, শ্লোগান দিয়েছে, অনশন করেছে, খঞ্জনি বাজিয়ে গান গেয়েছে, 'অচ্ছুতোদ্ধারের গীতে'র পরিবর্তে শরমাজীর শেখানো 'অন্তরাষ্ট্রীয় সংগীত' গেয়েছে, জেগে উঠেছে সূর্য লাল-সূর্য… জাগরে কিষান ভাই, জাগ! জাগরে মজদুর ভাই জাগ।…

বৈষ্ণব মা-বাপের ছেলে গণপত। জন্ম থেকে বৈষ্ণব। যাকে বলে 'গর্ভদাস'। তা, শরমাজী যখন পরীক্ষা নেয় সে একবারেই উত্তীর্ণ হয়। …মুর্গীর ডিম নয়, কোন রকম ঘৃণা এবং সংকোচ ছাড়াই সে 'মুর্গমুসল্লম' খেয়ে ফেলেছিল। শরমাজী বলেছিল, 'সাবাস কমরেড। তুমি একেবারে জন্মজাত বিপ্লবী।'

স্কুল কলেজের ফেলিওর ছেলে-ছোকরারা বুঝবে কি কমরেডশিপ কাকে বলে। ‥ডেহ্‌রী অফিসে সাতজন সাথীর মধ্যে শ্রেফ দুটো

পাজামা, তিনটে হাফ প্যাণ্ট, আর একটাই মোটা ধুতি। এ নিয়েই সব সাথীরা আনন্দে কাজ চালিয়ে নিত। সপ্তাহ-ভর ছাতু গুলে খেত, ভালবেসে মিলেমিশে। ···এখন প্রতিটি সম্মেলনে খাবার সময় পাতের ওপরেই 'ইনকিলাব' শুরু করে দেয় সাথীরা—'এ কি ব্যাপার? কেউ খাবে ঘি-ভাত, আর কেউ শুকনো ভাজা? অন্যায়। জুলুম।'

আজ কোন সাথীকে সভার প্রচার করতে বলুন, জিপ ও লাউডস্পীকার ছাড়া। সঙ্গে সঙ্গে চটে জবাব দেবে, 'আমি কি ভলেন্টিয়ার?' নিজের পার্টিসভার প্রচার করতে এদের লজ্জা করে। পার্টির ঝাণ্ডা কাঁধে নিয়ে চলতে এদের সম্মানহানি হয়। অথচ গণপত একাই ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা ও প্রচার করেছে—'ভাইগণ। দেশের গরিবী দূর করার জন্য, পুঁজিবাদ খতম করে কৃষক-শ্রমিক রাজ কায়েম করার জন্য, আজ বিকেল চার ঘটিকায়—'

গণপত না থাকলে গ্রামে কি এই 'শহীদ কিষাণ আশ্রম' খুলতো? তিন-তিনজন নামকরা অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর জমিদারের খুনে এলাকায় কোন 'ওয়ার্কার' কখনও কাশবার জন্যও আসতো না—ভয়ে। দিনে-দুপুরে খুন করে লাশ গায়েব করে দেয়া তিন জমিদারের আটশো একর জমিতে 'বকাশু সংঘর্ষ' চালানোর প্রস্তাব পাশ করে পার্টি মাসের পর মাস চুপচাপ বসে থাকে। না কোন বাহাদুর কমরেডের পা কখনও এগিয়ে গেছে, না কোন বিপ্লবী কৃষক এগিয়ে এসেছে। তখন গণপতই বোলতার চাকে হাত রাখে। জমিদারের সেপাইরা তাদের ধারণা-মাফিক মেরে ফেলে দিয়েছিল। কিন্তু গণপত মরতে-মরতে বেঁচে ওঠে। জ্ঞান ফিরে আসতে হাসপাতালে চেঁচিয়ে উঠেছিল—'বকাশু আন্দোলন জিন্দাবাদ! বিস্থনপুরের কৃষক জিন্দাবাদ!' —ইত্যাদি। গণপত যদি সেদিন আহত হয়ে হাসপাতালে না পৌঁছত, তাহলে মামলা 'বকাশু বোর্ড'-এ কখনও যেত না। আটশো একর জমি মাগ্‌না জেতার পর বিস্থনপুরের কৃষকরা দু একর

জমি মিলে-মিশে আশ্রম খোলার জন্য দেয়—তাও অনেক বলে-কয়ে এবং ধিক্কার দেয়ার পর।

আশ্রম খোলার পর থেকেই, সারা জেলার কমরেডরা অঘ্রাণের শুরুতেই থলে-বস্তা নিয়ে হাজির হয়ে পড়ে-ধান আদায় করতে, কারো বোনের বিয়েতে সাহায্য দরকার, কারোর বা ঘরখরচের জন্য। গণপতকে একই সঙ্গে নিজের এলাকার সুনাম ও পার্টি কমরেডের ইজ্জত বাঁচাতে হয়।

সারা জেলায় শুধু এই একটা অঞ্চল, যেখানে পার্টির প্রার্থী বিধানসভার জন্য জয়ী হয়েছে—কেবল এই আশ্রমের মহিমায়। লণ্ঠন দপ্‌দপ্‌ করে নিভে যায়। গণপতের মনে সহসা 'নির্গুণে'র একটা পদ বেজে ওঠে—তেরো জনম অকারথ জায় মুরখ—তোর জনম অকারণে যায় মূর্খ—

গণপত স্বপ্নে দেখে—পার্টি অফিসের বাক্স তুলে নিয়ে চোর পালিয়ে যাচ্ছে। সে চিৎকার করার চেষ্টা করে: চো-ও-ও-ও! চো-চো-চো-চো!—

গণপতের স্বপ্ন মিথ্যে নয়, সত্য প্রমাণিত হয়।

সকালে কমরেড চন্দ্রিকাজী এক মহা অশুভ খবর শোনায়, 'পার্টি দু ভাগ হয়ে গেছে।'

গণপতের মনে হয়, কমরেড চন্দ্রিকার মুখনিঃসৃত কথা বজ্রপাত ঘটিয়ে দেয়। কাগজ-পত্র, চাঁদা-বই, রসিদ-ভাউচার স্ট্যাম্প, সমস্ত কিছু গায়েব। গণপত বলে, 'কাল একপ্রহর রাত্রে বলরাম এসেছিল।'

গণপতের কথা শেষ হয়নি তার আগেই কমরেড চন্দ্রিকা তার গালে জোরে থাপ্পড় কষিয়ে দেয়। সে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কিছু বলতে চাইছিল, কিন্তু কমরেড চন্দ্রিকা চেঁচাতে থাকে—'আপনাকে এখানে কি কাজে রাখা হয়েছে? চাঁদা তুলে পেট চালাবার জন্য

শুধু! আপনি জানেন না যে বলরাম ডিসিডেণ্ট, মানে দলত্যাগী মেম্বারদের সঙ্গে আছে? অ্যা?'

'জানতাম না।' গণপত সোজাসুজি সঠিক কথা বলে, 'কে দলত্যাগী আর কে দাগী, আমি জানবো কি করে?'

'আপনি বেইমান!' চন্দ্রিকা আঙুল তুলে পিস্তলের নিশানা করার মত ভঙ্গিতে বলে, 'আপনি পার্টির সঙ্গে বেইমানী করেছেন। আপনি জোচ্চর।'

একের পর এক ধারালো ও ছুঁচলো গালাগাল গণপতের দেহে বিঁধতে থাকে। আশেপাশে সারা গাঁয়ের লোকেরা—মেয়ে-পুরুষ—জমা হয়ে পড়ে। বেইমান, জোচ্চর! প্রতারক!

কমরেড চন্দ্রিকা যাবার সময় হুঁশিয়ার করে দিয়ে যায়, 'এর ফলাফল পরে যাই হোক না কেন, আমি এখন আপনাকে বরখাস্ত করছি। চলে যান এখান থেকে।—'

কমরেড চন্দ্রিকা চলে যাবার পরেই কমরেড বলরাম তার নতুন সঙ্গী-সাথী নিয়ে হাজির হয়। গণপতের ড্যাবডেবে চোখ ভিজে ওঠে।

বলরাম বলে, 'কমরেড গণপত, কাঁদবেন না। শক্তি ও সাহস দিয়ে এই ডিক্টেটারশাহীর মোকাবিলা করতে হবে। পেটিবুর্জোয়ার বাচ্চাবা পার্টিকে নিজের জমিদারী ভেবে নিয়েছে।'

গণপত ভরাট স্বরে বলে, 'কমরেড বলরামজী, আপনি এমন কাজ করলেন কেন? যদি জানতাম আপনি পার্টি অফিস থেকে জিনিসপত্তর নিতে এসেছেন, তাহলে কথনোই...'

বলরামের পরিবর্তে এবার বলে ওঠে অকালু মহতোর আধপাগলা ছেলে সুধীর মহতো, 'গণপতজী, আপনি ডুবে-ডুবে জল খান, আর ভাবেন, কেউ বুঝি জানে না! এটা পার্টি অফিস। দিনরাত বাল-বিধবাকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করার জন্য তৈরী হয় নি।'

গণপতের এবার লজ্জায় মাথা কাটা যায়। জনসাধারণের

সামনে তার সব সম্মান ধূলিসাৎ হয়ে পড়ে। তাকে উলঙ্গ করে দিয়েছে সুধীর মহতো। সে বেইমান, জোচ্চর, বদচলন। আর কি বা থেকে গেছে দেখা-শোনার।

যাবার সময় বলরাম লাল রংয়ের হ্যাণ্ডবিলের একটা বাণ্ডিল দিয়ে বলে, 'আজ হাটে, স্টেশনে, সমস্ত জায়গায় এগুলো বিলি হওয়া দরকার। বুঝেছেন?'

গণপত তাও ঝুপড়ির ভেতর যায়, বিছানার উপর কাটা গাছের মত পড়ে যায়। তার শরীরের প্রতিটি রোমকূপে গালাগাল বিঁধছিল। সে লাল হ্যাণ্ডবিল হাতড়ে পড়তে শুরু করে। পার্টির কয়েকজন বড় বড় লীডার জনতাকে সাবধান করেছে—কিষাণ মজছুরের নামে, পুঁজিপতিদের টাকায় পার্টি চালানো ধোঁকাবাজদের থেকে সাবধান।

এরপর একটা শব্দও সে পড়তে পারে না। গালি-গালাজ, কাদা-গোবর। ··সব গুড় এখন গোবর।

গণপতের পেটে পিত্তের প্রকোপ শুরু হয়। এখন 'বায়ু'র চাপ জোরে উঠবে। হ্যাঁ, গণপতের বমি-বমি করছে।

কে আসল, কে নকল? কমরেড চোরঘড়ে অথবা কমরেড যাদব। গত বছর প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করতে এসেছিলেন চোরঘড়েজী। স্বাগত-ভাষণে যাদবজী তার কতই না প্রশংসা করেছিলেন। ···সব মিথ্যে। চোর-ঘড়েজী বিহারের পার্টিকে দেশদ্রোহীর দল বলেছে এই হ্যাণ্ডবিলে।

গণপত ঠিক করে সে পাটনা যাবে, দিল্লী যাবে। সব জায়গায় বড় ও ছোট 'সাথী'দের সঙ্গে দেখা করে কথা বলবে, কাঁদবে, বিলাপ করবে, জনতার দুর্দশার কাহিনী শোনাবে। খঞ্জনি বাজিয়ে গান গাইবে—'ভৈয়া, ঝগড় ন জাহু কচহরিয়া··· ।'

যাদবজী আর চোরঘড়ে কেন্দ্রীয় পার্টি অফিসের সামনে লড়াই করছে। তরবারি নিয়ে একে অপরের ওপর হামলা করে, গণপত

তাদের দুজনের মাঝে গিয়ে দাড়িয়ে পড়ে—'শান্তি, শান্তি!' কিন্তু দুজনের তরবারি গণপতের ঘাড়ের ওপর।

গণপতের চোখের সামনে পনরো বছর আগে দেখা কোন নাটকের দৃশ্য ভেসে ওঠে, আবার মিলিয়ে যায়। তার শরীর থেকে থেকে শিউরে ওঠে। ম্যালেরিয়া জ্বর ওঠার আগে এরকমই শিহরণ এবং কাঁপুনি শরীরকে একেবারে ঝাঁঝরা করে তোলে।

গণপত কম্বল জড়িয়ে নেয়, বমি করে, মৌরীর দানা মুখে ফেলে শুয়ে পড়ে। শিহরণের পর তীব্র জ্বর, সেই সঙ্গে 'বায়ুর' প্রকোপ। বিকার ওঠে। চল্লিশ বছর পরে—দেশ থেকে ম্যালেরিয়া উচ্ছেদের পর গণপত এই প্রথম জ্বরে পড়ে। এর মধ্যে কখনও মাথার যন্ত্রণাও হয়নি। তার মুখ থেকে প্রথম করুণ ডাক বেরোয়—'মা-আ-গো-ও-ও-ও। পারবতী —ঈ-ঈ-ঈ।'

সে দেখে, শর্মাজী এসেছে, হাতে লাল-লাল আপেল এবং কমলালেবু নিয়ে। ফলের রস বার করে গণপতকে বলে—'খেয়ে নাও কমরেড। বুক ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।' গণপত এক চুমুক খায়। তার গলা জ্বলতে শুরু করে। কটু বিষ।

পারবতিয়া আসে। পায়ের ধারে বসে পা টিপতে থাকে। কিন্তু গণপতের বড়দাদা এবং বাবা হাতে করে মালা নিয়ে আসে, চোখ রাঙাতে থাকে।

ভাগলপুরে রেশম মজদুর য়ুনিয়নের হরতাল। গণপত খঞ্জনি বাজিয়ে মিছিলের সামনে গান গাইছে—'দুনিয়ার মজদুর এক হও···'

পুলিশ কাঁদানে-গ্যাস ছাড়ে। ঘোড়সওয়ার সেপাই ঘোড়া ছুটিয়ে হরতালিদের চাবুক দিয়ে সপাং সপাং করে মেরে, টেনে-হেঁচড়ে, তারপর ধুলো উড়িয়ে চলে যায়।

গণপত জেলের একটা নোংরা সেলে পড়ে আছে। মাথায় পট্টি বাঁধা। পারবতিয়া—পারবতিয়া···পারু-উ-উ!···

সাতদিন ভুগে ওঠার পর জ্বর সেরে ওঠে। হাসপাতালের ডাক্তারসাহেব মন-প্রাণ দিয়ে চিকিৎসা করেন। কুসমী বলছিল- 'দু-দুটো ইনজেকশন একসঙ্গে দিতেন ডাক্তারবাবু।' আর এই ডাক্তারের বিরুদ্ধেই কিনা গণপত, বলরামের কথনানুসারে, হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে বিলি করেছিল—বিশনপুর হাসপাতালের জুলুমবাজ ডাক্তারকে অবিলম্বে বরখাস্ত করা হোক।

শুধুমাত্র সাতদিনের জ্বর নয়, গণপতের মনে হয় পঁয়ত্রিশ বছর ধরে চেপে থাকা জ্বর আজ সেরে যায়। এতদিন ধরে সে এক 'অন্ধ সুড়ঙ্গে'র ভেতর হাঁটছিল—অর্থহীন, অকারণ।

কুসমী গরম দুধে ধানের খৈ মাখিয়ে আনে। 'ডাক্তারসাহেব বলেছেন পথ্যে মাগুর মাছ হওয়া চাই। শোভিতকে পাঠিয়ে দিয়েছি। সাঁঝ পড়তে পড়তে এক-আধসের মাছ নিশ্চয়ই নিয়ে আসবে।'

তারপর বলে, 'এই সাতদিনে গাঁয়ের বাচ্চা-বাচ্চা ছেলেরাও এসে দেখে গেছে, কুশল সংবাদ নিয়েছে কিন্তু কোন সাথী কমরেড্ উঁকি মেরে দেখতেও আসেনি। কাল বলরামবাবু এসে বলে গেছে গণপতকে নিজের বাড়ীতে নিয়ে যাও। পার্টি অফিস খালি করে দাও। ওকে বরখাস্ত করা হয়েছে।'

পরিবার, জাতি, ধর্ম, সমাজ, সরকার এবং সমস্ত অন্যায়, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সর্বদা লড়াইকরা লড়াকু গণপত আজ কুস্তির আখড়ায় পরাজিত পালোয়ানের মত পড়ে আছে। সকলেই তার পিঠে লাথি মেরে, গালাগালি দিয়ে চলে যায়।··· পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সাধু-সন্ন্যেসীদের মত লেঙ্গটবন্দী থেকে, জিভ-মুখ এবং মনে লাগাম বেঁধে, সে পাবলিকের কাজ করেছে। কারও একটা কুটো চুরি করেনি, পার্টির একটা পয়সাও গোলমাল করেনি। মা-বাপ, ভাই-বোন, গাঁ-সমাজ, এবং পারবত্তিয়ার চেয়েও বড় পার্টি, এবং পার্টির পতাকাকে ভালবেসেছে! সব বে-কা-র!···

গণপতের মনে হয় সূর্যেও ফাটল ধরেছে। পৃথিবীর সব জিনিস আজ দু-ভাগে বিভক্ত মনে হয়। প্রতিটি মানুষের দুটো অংশ, দুটো মুখ এবং বিদীর্ণ হৃদয়।

যেসব কথা আজ অব্দি পুঁজিপতি ও সাম্রাজ্যবাদী এবং স্বৈরাচারীদের কথা মনে করে অশ্রাব্য বলে সরিয়ে দিত, আজ সেসব কথাই বার-বার মনে পড়ে।…

গণপত, তোমার লীডাররা, অর্থাৎ তোমার পার্টি, জাতি ও ধর্মকে আফিম বলে থাকে। কিন্তু ওরা নিজের ছেলেমেয়ের বিয়ে অন্য কোন জাতের সঙ্গে দেয় না কেন? ছেলের বিয়েতে কমরেড রামলগন শরমা পঁচিশ হাজার টাকা বরপণ গুণে নিয়েছে। তোমাদের লীডারের ছেলেরা দার্জিলিঙ-দেহরাদুনে পড়ে। তোমাদের সেক্রেটারীর স্ত্রী কংগ্রেসী মিনিষ্টার হবার জন্য জাতের লোকদের নিয়ে দলবাজি করে। তোমাদের তুফান-জী মিল মালিকের সঙ্গে মিলে মজদুরদের গর্দানে ছুরি…!

গণপতের সামনে একে-একে অনেক বড় বড় কমরেডের ছবি ফুটে ওঠে। চোরঘড়েজী, যাদবজী, গোপালজী, সিন্‌হা সাহেব, ঠাকুরজী, তুফানজী। সবকটা ছবির মুখ থেকে কেবল একটাই কথা বার হয়—'আমরা ভুল পথে ছিলাম।…'

এক অন্ধ-সুড়ঙ্গ থেকে বাইরে বেরিয়ে গণপত বেদম পড়ে আছে। তার হলদেটে চেহারায় মিশেল গোঁফ ঝুলে আছে।… পঁয়ত্রিশ বছর ধরে সে ভুল পথে ভুল দিশায় এগিয়ে চলেছে। না-জানি কত ভুল করেছে। না-জানি কতজনকে গুমরাহ্‌ করেছে।

পারবতিয়ার পেট যদি না খসানো হতো, তাহলে তার সন্তান আজ পঁয়ত্রিশ বছরের হতো। যদি ছেলে হতো তাহলে বলরামের বয়সীই হতো এতদিনে।

গত পাঁচ বছর ধরে কুসমী তার সঙ্গে 'প্রেম ভালবাসার' ব্যবহার করে আসছে। গণপত সব বুঝেও না-বোঝার ভাব দেখায়। কিন্তু,

বিধবা কুসমী সতীনারীর মত টুকুর-টুকুর করে তার মুখ চেয়ে দেখে। তার ওপর আজ অকালু মহতোর মাতাল ছেলে ঠেস মেরে গেছে—'বালবিধবার সঙ্গে ফস্টিনস্টি… ?'

কুসমী ভরত নাপতেকে ডেকে আনে। চুল কাটার সময় কুসমী বলে, 'গোঁফটাও কামিয়ে দাও। দুধ-বার্লি খাবার সময় 'ছ্যাপ-ছ্যাপ' হয়ে পড়ে।…'

আলুসেদ্ধ আর গরম ভাত খেয়ে মুখের কষটে ভাব দূর হয়। মৌরীর দানা মুখে দিয়ে সে আয়নায় চেহারা দেখে।…আশ্চর্য! তার মুখটা সেই ঠিক মুমূর্ষু ঘোড়ার মত লম্বা হয়ে পড়েছে, যার (পঁয়ত্রিশ বছর পূর্বে) সামনের দুটো পা দড়ি বেঁধে কসাই-মালিক ছেড়ে দিয়েছিল। মেজের ওপর শুয়ে, 'হাঁকু-পাঁকু' করে নিঃশ্বাস টানতে টানতে, পা দুটো দাবড়াতে-দাবড়াতে…ওর শরীরে না জানি কত ঘা করে দিয়েছিল কাক। কিন্তু, পারবতিয়া 'দা' নিয়ে দৌড়ে গেছিল। পায়ের বন্ধন কাটার পর, 'মরণাপন্ন' ঘোড়া বসে পড়েছিল, মাথা ঝুঁকিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে মাটি শুঁকতে থাকে।…

গণপত ধীরে ধীরে তার পা প্রসারিত করে।

বাইরে কমরেড চন্দ্রিকার গলার আওয়াজ শোনা যায়। লাল পাগড়ির একজন সেপাই উঁকি মেরে ভেতরে ঢোকে, দেখে, এবং বলে, 'চাপরাশি, চাটাইর ওপর ওপর পা ছড়িয়ে বসে আছে।'

থানার দারোগা এবং সেপাইকে দেখে গণপতের শূন্য, ফাঁকা মগজ ভারি হয়ে ওঠে। শিরায় ঝনঝনানি শুরু হয়। সে একবার কমরেড চন্দ্রিকার দিকে চেয়ে দেখে। দারোগা সাহেব বলে, 'দেখ গণপত, তুমি আশ্রমের চাপরাশি ত ?'

'তুমি-তামি বলবেন না। আমি কারো চাপরাশি নই।

দারোগা চন্দ্রিকার দিকে তাকায়।

চন্দ্রিকাজী বলে, 'শোনো গণপত, দারোগা সাহেব আশ্রমে ১৪৪ ধারা জারি করতে এসেছেন। তুমি ..'

গণপত এতক্ষণে ভাল করে সামলে নিয়েছে। সে স্বচ্ছ এবং দৃঢ় স্বরে জবাব দেয়—'এখানে আশ্রম কোথায় ? এটা আমার বাড়ী, আমার জমি। এটা সার্বজনীন সম্পত্তি নয়, কোন পার্টি-দলের আখড়াও নয়।'

সেপাই তখন ভেতরে উঁকি মেরে কিছু দেখছিল। গণপত ঝাঁঝালো স্বরে বলে, 'অ্যাই সেপাইজী, ওদিকে 'মেয়ে-মহলে' উঁকি-ঝুঁকি মেরে কি দেখছেন ? চাকরি ভার লাগছে বুঝি ?'

দারোগা জিজ্ঞেস করে, 'তুমি···তোমার···আপনার কাছে কোন প্রমাণ আছে ?'

'প্রমাণ ? কেমন প্রমাণ ? লিখিত নাকি মৌখিক ? সাক্ষী ? ·· শোভিতের মা, আমার থলেটা এদিকে দিয়ে যাও।'

শোভিতের মা, অর্থাৎ কুসমী ঘোমটা টেনে বাইরে আসে। গণপত থলে থেকে নিজের 'পুঁথি-পত্তর' বার করতে থাকে—'মার্কস্‌বাদের মূলকথা', 'কিষাণ ও শ্রমিক গীত', 'অত্যাচারী জমিদার ···গীত, বৈজওয়াড়ার প্রসিদ্ধ প্রস্তাব, তেলেঙ্গানার লাল ভবানী, শহীদ ফিল্মের গান, 'দেশের শত্রু,' গণতন্ত্র···এই নিন লিখিত প্রমাণ। মৌখিক সাক্ষী চাই ? গাঁয়ের বাচ্চাদের ডেকে জিজ্ঞেস করে নিন।'

দারোগা সাহেব ভাঁজ করা দস্তাবেজ খুলে আগাগোড়া পড়ে। তারপর হেসে চন্দ্রিকাজীর দিকে তাকিয়ে দেখে, 'এ তো ঠিকই বলছে বলছেন। জমি-সম্পত্তি সব এঁর নামেই রেজেস্ট্রী করা।'

চন্দ্রিকাজী এবার চেঁচাতে থাকে—'বেইমান কোথাকার। 'পাবলিক' প্রপার্টি হজম করতে চাস ? দেখি কদ্দূর তুই··'

গণপত উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে। 'পাবলিকের নাম নিও না চন্দ্রিকা, পাবলিক অন্ধ নয়, সব কিছু দেখে, বোঝে। নিজেদের 'স্বার্থের জন্য পার্টি-কে টুকরো-টুকরো করা লোকেরা··'

কুসমী ভেতর থেকে বলে, 'এদের সঙ্গে মুখ লাগানোর দরকার

কি ? ডাক্তার সাহেব বারণ করেছেন না ? যুদ্ধে মরে বলদ আর বসে খায় ঘোড়া।'

কিন্তু গণপত ততক্ষণে স্লোগান জোরদার করে ফেলেছে—'ইনকিলাব জিন্দাবাদ !··· বিভেদবাদ মুর্দাবাদ ! ···পার্টির শত্রু, খতম্ হোক !' সম্মিলিত ভিড়ে সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনার ঢেউ ছড়িয়ে পড়ে ! লোকেরা গণপতের সঙ্গে সঙ্গে স্লোগান দিতে শুরু করলে দারোগা সাহেব দ্রুত বাইরে বেরিয়ে যায়। সে চন্দ্রিকাকে ইংরেজীতে কিছু বলে।

সেপাই ঘাবড়ে গিয়ে বলে, 'হুজুর, এটা পার্টি-আলাদের ঘরোয়া ঝগড়া। এখানে আর বেশীক্ষণ দাঁড়ালে ঘটনা অন্যদিকে মোড় নেবে।'

দারোগা আর চন্দ্রিকা যাবার পর সম্মিলিত লোকেরা জয়-জয়কার করে, 'বোলিয়ে একবার প্রেম-সে গণপতজী কী জয় ! কিষানদের নেতা—গণপতজী ! মজদুরনেতা—গণপতজী ! গণপতজী জিন্দাবাদ ! যে আসবে বাধা দিতে, চুরচুর হয়ে যাবে !'

পঁয়ত্রিশ বছরে এই প্রথমবার নিজের 'জয়' এবং 'জিন্দাবাদ' এর স্লোগান শুনে গণপতের হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে।

কোলাহল এবং কলরবের মধ্যে কে যেন বক্তৃতা দিতে শুরু করে—'ভাইসব, এবার গ্রাম-পঞ্চায়েতের নির্বাচনে, মোড়লের নির্বাচনে এই লম্বা পাঞ্জাবী-পাজামা পরা ফোকটিয়া বাবুদের দূর করে দাও।··· আজ রাতে এখানে খুব ধুমধামের সঙ্গে 'কিষাণকীর্তন' হওয়া দরকার।'

সবাই চলে যাবার পর, ফাঁকা হলে, গণপত ঝুপড়ির ভেতর থেকে আওয়াজ দেয়—'শোভিতের মা !··· একটু এদিকে এসো।'

কুসমী ভেতরে আসে। গণপতের চেহারা দেখে সে ভয় পায়—আবার জ্বর এলো নাকি ? সে গণপতের কপালে হাত ঠেকায়। গণপত কুসমীর কব্জী ধরে ফেলে। তার ঠোঁট কাঁপে। সে কুসমীর চেহারা নিজের মুখের কাছে টেনে আনে। কাঁপা-কাঁপা স্বরে বলে,

'কুসুম,…কিন্তু এ যে পাপ, অন্যায়। পাবলিকের সম্পত্তি, পার্টির জমি…আশ্রমে…এটা পাপ—ঘোর পাপ!'

ভাজা মৌরির গন্ধ কুস্‌মীর খুব ভালো লাগে। সে অভিমানী স্বরে বলে, 'কিসের পাপ? চন্দ্রিকাবাবু পার্টির চাঁদায় পুরনিয়ায় পাকা ঘর তৈরী করেছে। রামলগনবাবু জমিদারের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে গরীব রায়তদের মোকদ্দমা বরবাদ করে দিয়েছে। তাতে—'

'কুসুম, লোকেরা যাই করুক। আমার দ্বারা এই পাপকর্ম আর হবে না। তুমি আমাকে·· তুমি আমাকে যদি বাঁচাতে চাও তাহলে তোমার কুঁড়েঘরে নিয়ে চলো।'

কুসমী কয়েক মুহূর্ত গণপতের টলটলে চোখ ও টকটকে মুখ দেখে। তারপর বলে, 'আর…এই আশ্রম?'

'আমি লোকদের জমি ফেরৎ দিয়ে দেবো। দশজনের দেয়া জিনিস 'ধর্মাদা' হয়। তাকে একা ভোগ করলে কখনো সুখ-শান্তিতে থাকতে পারে না।…তাছাড়া এখন আমার দ্বারা পাবলিকের কাজ করা হয়ে উঠবে না। পার্টিই যখন ভেঙে গেছে…'

সে ছোট্ট ছেলের মত ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

কুসমী তার নোংরা আঁচল দিয়ে গণপতের অশ্রু মোছাতে মোছাতে বলে—'কেঁদো না।'

গণপত কুসমীকে বুকে জড়িয়ে ধরে।…আছে! পঁয়ত্রিশ বছর পরে নারী-বক্ষের উত্তাপ তার শরীরে এই প্রথমবার ঝড়ের মত লেপ্টে যায়। সে কুসমীর কালো-কালো ঠোঁট স্পর্শ করতে মুখ এগোয়, কিন্তু থেমে পড়ে।

'না কুসুম, এখানে নয়। এখানে নয়…তোমার ঘরে চলো। এখানে আর এক মুহূর্তও থাকার কোন অধিকার নেই আমার।'

'কুসমী উঠে দাঁড়ায়। গণপতের হাত ধরে তুলতে-তুলতে বলে 'চলো।'

'মা! মাগো! দেখো, কত মাছ এনেছি।'

শোভিত বাঁশের ঝুড়ি সামনে রাখে। কালো-কালো মাগুর মাছ চিক্ চিক্ করতে থাকে।

কুসমী বলে, 'মাছে যাত্রা নাকি শুভ।'

গণপত হাসে।

কুসমী তার একমাত্র কিশোর ছেলেকে বলে, 'বাবুরে, তুমি কাকাকে ভর দিয়ে নিয়ে চলো। আমি বিছানা গুটিয়ে নিয়ে আসছি।'

শোভিত মার মুখের দিকে চেয়ে বলে, 'কোথায় ?'

গণপত বলে, 'যেখানে তোমার মন চায়, বেটা।'

গণপত একবার ফিরে চেয়ে দেখে। পার্টির পতাকা হয়েও ফরফর করছে, বাতাসে। তার মনে হল, সে নিজে পার্টির পতাকা, যা শোভিত কাঁধে করে বয়ে নিয়ে চলেছে।...

হাতের যশ আর কথার সত্য



এবার তিন বছর পর গাঁয়ে ফিরেছি।

ষ্টেশনের কাছে, বদ্‌রীভগতের খিড়কীর কাছে দাঁড়ানো বুড়ো ডুমুর গাছটার দুরবস্থা এক ঝলক দেখেই বুঝতে পারি—কয়েক মাস ধরে এ অঞ্চলে ভয়াবহ শিশুরোগ আতঙ্ক বিস্তার করেছে, এবং জগ্‌গু পান্সারী এখনো বেঁচে আছে।...ডুমুর গাছের ছাল নেই, দেখলেই বুঝবে (গাঁয়ের) অবস্থা ভালো নেই। ডুমুরের দুধ এবং গাছের ছাল সেই নাম-হীন রোগের একমাত্র অমোঘ ওষুধ। আজও কি ?... জগ্‌গু পান্সারী আজও চ্যালেঞ্জের সুরে হয়তো বলে বেড়ায়—সিভিল সারজেণ্ট হোক কিংবা ট্যান ব্যানারজী ডাক্তার-ই হোক। এ রোগের নামই তাঁরা জানে না। ওষুধ দেবে কি ?

গাড়োয়ান কে জিজ্ঞেস করি—'হ্যাঁগো, কুসুমলাল, জগ্‌গু পান্সারী বেঁচে আছে ?'

কুসুমলাল সুর টেনে এক-শব্দে জবাব দেয়—হ্যাঁ-এ্যাঁ-এ্যাঁ-। যার মানে—হ্যাঁ, কোন রকমে বেঁচে আছে। ঠোঁটের নীচে খৈনি-তামাক থু থু করে ফেলে দিয়ে নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করে—বেঁচে আছে বটে। তবে, ধরে নিন এক রকম মরে বেঁচে আছে।

—অসুখ করেছে ? কি হয়েছে ?

কুসুমলাল বলদ দুটোকে একটা অশ্লীল গালাগাল দেয়। তারপর বলে— হবে আবার কি ?

কুসুমলাল হাসার চেষ্টা করে—গতবছর মতিভ্রম হয়েছিল। বুঝলেন, এই বুড়ো বয়সে 'জোয়ান-কড়কড়ে' এক পাহাড়ি ছুঁড়িকে বাড়ীতে এনে তুলেছে। সেই থেকে ওষুধ-পত্তর, হাট-বাজার সব বন্ধ। সারাদিন উঠোনে বসে পাহাড়ি ছুঁড়ির সঙ্গে লীলা খেলা—বিশ্বাস করবেন, বুড়ো হাবড়া 'মেরা মন ডোলে মেরা তন ডোলে' গান গায় ?

তিন বছর পর গাঁয়ে ফিরেছি। কুসুমলাল গাড়োয়ান এই তিন বছরে বোবা থেকে বাচালে পরিণত হয়েছে—ষ্টেশনেই এটা বুঝতে পেরেছি! এখন বোঝা গেল, কুসুমলাল শুধু বাচাল-ই হয়নি, রসালো গপ্পোবাজ ও হয়েছে। আমি অবাক হলাম এই দেখে যে কুসুমলালের উৎসাহ বেড়ে গেছে। জগ্‌গু-প্রসঙ্গ আবার শুরু হয়—ছেলের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, মোড়ল-পঞ্চায়েত, ভাগ-বখরা—নিত্য ঝামেলা। তিতি-বিরক্ত হয়ে ছেলে রসিকলাল আলাদা হয়ে গেছে। এখন ওষুধ-পত্তর, হাট-বাজার সবই ঐ রসিকলাল করে। তা, রসিকলালের হাতের যশ আছে। বাপের চেয়ে এক কাঠি ওপরে যাবে।—এবারে খুব রোজগার করেছে। টাকা পিটে একেবারে পাহাড় করে ফেলেছে। পাকা বাড়ী তৈরী করছে।

…এই কার্তিক মাসে হাল-ছেড়ে-দেওয়া কুসুমলালের ছেলেটাকে,

এই রসিকলাল-ই তো যমের হাত থেকে বাঁচালো। সে রসিকলাল-কে ধন্বন্তরীর অবতার মনে করে। মানে? আমার প্রাণটাও জগ্‌গু পান্সারীর হাতেই পাওয়া। এবং আমি স্বীকার করি, জগ্‌গুর শেকড়-বাকলের টোটকায় কোন সঞ্জীবনী বুটিও আছে। সঞ্জীবনী বুটি না থাকলেও সেই জাতের (গ্রুপের) বুটি ওর কাছে নিশ্চয় আছে। ...কিন্তু কুসুমলাল উঠে পড়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করতে থাকে, বাপের চেয়ে বেটা এক ধাপ ওপরে। তাই সে জগ্‌গু পান্সারীর নিন্দে করতে শুরু করে—শুনি সে যৌবন ফিরে পাবার সবচেয়ে দামী শেকড়—যা ওর ঝোলায় ছিল...মানে, গোটা দশেক বুড়োর খোরাক—সব একসঙ্গে খেয়েছে। শীতের রাতেও তিনবার করে স্নান শুরু করেছে জগ্‌গু বুড়ো।...আজ্ঞে না, আগে এমনটি ছিল না। ছেলের গাওনা (দ্বিরাগমন) হলো, নতুন কনিয়া ঘরে এলো। তারপরই না জানি কি হলো ওর। পরের মাসেই কোত্থেকে এক কড়কড়ে জোয়ান...কুসুমলাল যখনি জগ্‌গুর পাহাড়ি বৌর কথা বলে, 'কড়কড়ে জোয়ান' বিশেষণটি প্রয়োগ করতে ভোলে না। রসিকলালের নতুন-বৌও জোয়ান। সাজ-গোজও করে, করা উচিৎ-ই। কিন্তু...।

—কিন্তু কি?

—কিন্তু এই বুড়ো ভাম তো সবাইকে মাৎ করে দিলো। রসিকলালের বৌ-টা একদিন ফিনফিনে কাপড়ের কামিজ পরে নাচ দেখতে গেছিল—ঐ যে বায়স্কোপের নাচ। পরদিনই জগ্‌গু বুড়ো তার জোয়ান-পাহাড়ি মাগীটাকে এমন 'ইশপিরিংঅলা মেমকাট কামিজ' পরিয়ে বাড়ি থেকে বার করলো যে যারা দেখলো তাদের চোখ একেবারে ।

কুসুমলাল সে কথাটাকে 'হাইলাইট' করতে চায়, সেটা অসম্পূর্ণ ই ছেড়ে দেয়। আমায় জিজ্ঞেস করতে হলো—কেন, কি হলো?" দেখনেঅলাদের চোখ খারাপ-টারাপ হয়নি তো?

কুসুমলাল তেরছা চোখে একবার আমাকে দেখে। চুপ করার

আগে এক লাইন মন্তব্য করে—এখন ওর হাতে যশ ও নেই, কথায় কোন দামও নেই। সব ঐ পাহাড়ি মাগী চুষে নিয়েছে।

॥ ২ ॥

হাত যশ আর কথার সত্য।

জগ্‌গুর 'হাত যশ' আর 'সত্য কথা' সম্পর্কে বহু কাহিনী প্রচলিত ছিল। ত্রিশ-চল্লিশ বছর ধরে জগ্‌গুর 'যশ' এবং 'সত্যের' গল্পগুলো যেন জগ্‌গুর নিজেরই মনগড়া। ছোট-বড় নানান রকমের সব অবাক করা গল্প।···গোদানের পর জগ্‌গু এসে রোগীর নাড়িতে হাত রেখে বললো—কে বলে মরে গেছে? ব্যস, এমনি এক পুরিয়া ওষুধ দিলো আর বুড়োও উঠে বসলো।···কসবা শহরের বিখ্যাত জমিদার-গিন্নীর সবকটা দাঁত নতুন করে গজালো বুড়ো বয়সে। ছোলা ভাজা খাওয়ার শৌখিন জমিদার গিন্নী আশি বছর বয়সেও পাথরের মত দাঁতে মিসি ঘষে···

চল্লিশ বছর আগেকার কথা।

যখন সুদূর পাড়াগাঁয়ে—যাবতীয় রোগের পেটেন্ট ওষুধ ছাড়া অন্য কোনো এলোপ্যাথিক ওষুধ এসে পৌঁছয়নি, এ অঞ্চলের কাঁওলা রোগ ভয়াবহ ভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। পয়সাঅলারা শহর থেকে বড় ডাক্তার আনিয়ে দেখালো—কিন্তু এ রোগের কোনো ওষুধ ডাক্তারদের কাছে ছিল না।···কোনো এলোপ্যাথিক ওষুধ তৈরীই হয়নি।

··গোটা এলাকায় এক হলুদ পেত্নি নেচে বেড়িয়েছিল। রোজ দু-তিনজন পটল তুলতো। শিশুদের সংখ্যা আধ ডজন থেকে দেড় ডজন। লাফানো-ঝাঁপানো-চঞ্চল-চপল আপন ভোলা শিশু হঠাৎ জ্বরের প্রকোপে চেঁচিয়ে উঠতো। তারপর, গোটা পৃথিবীটা হলদে ···হলুদের স্তূপ ··রক্তহীন দেহ···হলুদে রাঙানো লাশ!! দিন-রাত গাঁয়ের চারদিকে কাক-চিল, শকুন-শেয়াল-কুকুরের উৎসব।

এমনি দুর্দিনে একদিন গাঁয়ের পথে অদ্ভুত গলার নিনাদ শোনা গেল—তে-ও-য়া-আ-রী-ই-ই⋯ বদ্যি-বদ্যি-আ-য়-ও-ও-যু-উ-ধ-নি-ই-য়ে-যা -যা-!!

সবাই উঁকি মেরে দেখলো—হলুদ পাগড়ি বাঁধা আগে-আগে তেওয়ারী অর্থাৎ বৈদ্যজী (কবিরাজ) আর কাঁধে মোট নিয়ে পেছন-পেছন তাঁর চাকর। চাকর-টাই হাঁক দিচ্ছিলো, মেয়েদের সঙ্গে রোগের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ ও দর-দস্তুর সেই করছিল।

সেদিনই গোটা এলাকায় মুখে-মুখে কথা ছড়িয়ে পড়ে—পীত রোগই বলো, বা ন্যাবা বা হলদে কাঁওলা পিশাচ—তুড়ি মেরে এই রোগকে জব্দ করার বদ্যি এসে গেছে।

নবটোলী গাঁয়ে তেওয়ারী কবিরাজ আস্তানা গাড়লো।

তার চাকর জগ্‌গু সারাদিন বসে-বসে শেকড়-বাকল বাটে আর থেকে-থেকে রোগীদের অভয় দেয়—'পীত রোগ-ই বলো, কিংবা ন্যাবা বলো, অথবা কাঁওলা পিশাচ—সাহেবরা এর ওষুধ করবে কি করে! পীত রোগ শুনলেই ওদের চোখ-মুখ হলদে হয়ে পড়ে! বৈদ্যজীকে এক সাধু হিমালয় থেকে ফেরার পথে শেকড় বলে দিয়েছিলো, তাই তিনি এ রোগের ওষুধের জন্য কোন পয়সা নেন না। কেবল প্রণামী নেন, ধর্মশালা'র জন্য। গুরুর আদেশ। যথা শক্তি তথা ভক্তি!

শক্তির মাপে ভক্তি দেখালো সিমরাহার শেঠজী। একমাত্র ছেলেকে ন্যাবার হাত থেকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য মোহন শেঠ প্রণামী হিবেবে পাঁচশো টাকার থলে দিলো। নবটোলী গাঁয়ের নামই পালটে গেল। হলদিয়া নামে এই গাঁ খ্যাতি পেলো। অর্থাৎ, সেখানে ন্যাবা-মানে-পীত রোগের মত ভয়ঙ্কর রোগকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়ার মত বৈদ্যজী এসেছেন। হলদিয়া বৈদ্য। হলদিয়া গাঁ।

পনরো দিনের দিন তেওয়ারী কবিরাজের চোখে সূর্যের কিরণ হল্‌দে লাগলো। দুপুরের রোদও হলদে। তেওয়ারী কবিরাজ

বুঝতে পারলেন—কাওলা পেত্নি ভর করেছে। কুড়ি দিনের দিন চালাক-চতুর চাকর জগ্‌গুর সেবা-শুশ্রূষা এবং ওষুধ-পথ্যি সত্ত্বেও কবিরাজ নেতিয়ে পড়লেন। লাল দগ্‌দগে শরীর—হেন কৃষ্ণচূড়া ফুলের স্তূপ।

আশেপাশে বিশ গাঁয়ে নৈশব্দ্য নেমে এলো—এবার? এবার কি হবে, ভগবান?

—চিন্তার কোন কারণ নেই। কবিরাজ মশাই'ও চাকর বললো—আট বছর বয়স থেকে কবিরাজের ওষুধের মোট শুধু শুধু বয়ে বেড়াইনি। পাণ্ডু রোগ বলে, বা ন্যাবা বা জণ্ডিস।

হাজার-হাজার ভীত-ত্রস্ত মন আবার হেসে ওঠে—সত্যি? ...হ্যাঁ, কবিরাজের চাকর বটে। কবিরাজের সমকক্ষ-ই, খাটো নয় কোনো মতে। তুড়ি বাজাবারও দরকার নেই। আঙুল তুলে রুগীর দিকে ইশারা করতেই, রোগ একেবারে হাওয়া...।

সদ্যমৃত গুরুর প্রতি ভক্তিবাণী উচ্চারণ করার পর, চাকর জগ্‌গু কণ্ঠস্বর সামান্য নামিয়ে বলে—ভাই! মনোবৃত্তিই হলো আসল। গুরুর আদেশ, ধর্মশালার খাতে একশো টাকা তোলার সঙ্গে সঙ্গে কুটিরের ঠিকানার মনিঅর্ডার করে দেবে—সোজা হরিদ্বার। নিরানব্বুই টাকা পর্যন্ত নিজের কাছে রাখতে পারো!—তা, গাফিলতি বলো, বা মতলব, কিংবা ভবিতব্য—। ন্যাবা বলো কিংবা ভগবানের মার।

কবিরাজের চাকর জগ্‌গু। চাকর নয়, এখন সে নিজেই ষোল আনা কবিরাজ!! গুরুর চেয়ে এক কাঠি ওপরে জগ্‌গু কবিরাজ। গোটা এলাকা থেকে এক বছরেই ন্যাবা রোগ একেবারে নির্মূল করে ফেলে জগ্‌গু। সে প্রতিজ্ঞা করেছিলো—হয় আমি এখানে গেড়ে বসবো, নয় ঐ পাপিষ্ঠা কাওলা ন্যাবা পেত্নি।—নিশ্চয়ই সে ঠিক সময়ে মানিঅর্ডার—মানে, নিরানব্বুই-র পর একশো হতে-না হতে—পাঠালো, কুটিরের ঠিকানায়—হরিদ্বারে।

পাণ্ডুরোগ নির্মূল হবার পর, জগ্‌গু ঘোষণা করে—শুধু ন্যাবা নয়, যে কোন দুরারোগ্য রোগের ওষুধ দিতে পারি। লোকেরা দেখলো, সত্যি জগগু তার গুরুর চেয়েও খাঁটি। যা বলে, করে দেয় —জ্বরে পথ্য দেয় টক দই আর ভাত। কেঁতুলের অম্বলও।

ওষুধ আর টোটকা ছাড়াও জগগুর ছোট ছোট গপ্পের প্রভাব রোগীদের ওপর পড়তো হয়তো। ওষুধ বাটতে-ছেঁচতে, রোগীর নাড়ী দেখার সময়েও তার গপ্পো শেষ হতো না। রোগ নির্ণয়ের সময় সে নিজের গপ্পোর সার কথাগুলি শোনাতো। রোগ পরীক্ষার পর কোনো আশ্চর্যজনক কাহিনী!

—যেমন তামাকের বিখ্যাত ব্যবসায়ীর দেড় লাখ টাকার লোকশান হলো। সে ভাবলো, এই প্রাণটাকে দেহ-পিঞ্জরে বন্দী করে রাখা অর্থহীন। দু-পাশে ভর্তি 'মহিষাদাদ' বা একজিমা—কথা একই। একজিমার দরুনই দেড়লাখ টাকার লোকশান। ইংরেজরা আবার একজিমাকে দুরারোগ্য মনে করে। কে একজন তাকে আমার নাম করে।—দেখুন গে, পরশু থেকে কীর্তনের আয়োজন করেছে। মেঠাই বিলি হবে। মাত্র চারদিনেই শালার একজিমা ভূষির মত শরীর থেকে ঝরে পড়েছে। গিয়ে দেখতে পারেন।—এইসব গালগপ্পে জগ্‌গু পাটনার প্রসিদ্ধ ডাক্তার টি. এন. ব্যানার্জী সাহেবের নাম বার কয়েক টেনে আনবেই। একবারের ঘটনা—।

পুরনো কাশির চোটে ভেঙ্গে-পড়া বুড়ীর হুপিংকাশি—গপ্পোর প্রথম লাইন শুনেই থেমে যেত। জগগু তখন হুকোয় কল্‌কে এঁটে কিছুক্ষণ গুড়গুড় করতো। তারপর শুরু করতো—সেবার হলো কি, পরসা রাজের মানিজারের জামাইর পেচ্ছাপ বন্ধ হয়ে গেল। কবিরাজমশাইর কাছ থেকে চার মাসের ছুটি নিয়ে আমিও পরসা গিয়েছিলাম। পরসা আমার শ্বশুরবাড়ি।—তা, মানিজার সাহেবের জামাই'র পেচ্ছাপ বন্ধ হবার খবর সঙ্গে সঙ্গে গেজেটে ছাপা হয়ে

গেল। মানিজারের চাকরানী আবার সম্পর্কে আমার শালী। আমি ওকে বললাম, গেজেটে ছাপলেই কি পেচ্ছাপ বেরিয়ে আসবে? যাও, গিয়ে ওকে বিরি কলাই'র জল খাওয়াও। সে গিয়ে জানালো মানিজার-গিন্নীকে। মানিজার গিন্নী গিয়ে বললে ডাক্তার-কে। তা, 'সিভিল সারজান্ট' বললো—যতক্ষণ না পাটনা থেকে ট্যানব্যানার্জী সাহেব না আসেন, ওষুধ তো ছার—কারুর হাতে এক ফোঁটা জলও দেওয়া হবে না।—বেশ বাবা, আসুক ট্যানবনর্জী সাহেব। আমিও একবার চোখের দেখা দেখে নেবো। ট্যানবনর্জী ডাক্তার। একশো ডাক্তারের মধ্যে একজন, বুঝলে, 'হোল-ইণ্ডিয়ার' বাইরেও যাঁর যশ ছড়িয়ে আছে। এমন ডাক্তারের দর্শনও দুর্লভ।—তা, উড়ো জাহাজ ফট্‌ফট্ করে নামলো এসে পরসার পোলো-ময়দানে। উড়োজাহাজ থেকে নামলেন ট্যানবনর্জীসাহেব··· সবসময় হাসি মুখ ট্যানবনর্জী ডাক্তারের। কি ডাক্তাররে বাবা! গাড়ী চেপে প্রাসাদে এলেন। রোগীর নাড়ীতে হাত রাখলেন। পেট টিপে-টিপে দেখলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন—বিরিকলাই। শীগগির বিরির জল খাওয়াও। এক্ষুণি···।

তা, মানিজর গিন্নী আগে থেকে জলে বিরিকলাই ভিজিয়ে রেখেছিলেন। দিন কয়েক আগে মানিজার-গিন্নী তাঁর পঁচিশ বছরের পুরনো মাথার ব্যামো আমার হাতে সারিয়েছিলেন। তাড়াতাড়ি চামচে করে বিরি'র জল খাইয়ে দিলেন।—

জগ্‌গুর এইসব গপ্পে 'ডাবল ক্লাইমেক্স' যুক্ত হতো।

তা, প্রথম চামচ গিলতে না গিলতেই এমন টোটা ছুটলে—যার ফলে বিছানা, চাদর, গেজেট কাগজ, খবরের কাগজ, কাপড়-চোপড় সব—একেবারে জলে-জলাক্কার! যেন কাটিহার ইস্টিশানের জলের 'কলটেরি'ই খুলে গেছে, হি-হি-হি-হি!

কাশিতে জর্জরিত ফোক্‌লা বুড়ির মুখেও সলজ্জ হাসি ছড়িয়ে পড়ে। যুবতী মেয়েদের গলা থেকে হাসির ফোয়ারা ছুটতো। ছেলেরা হাসতে হাসতে কাহিল!

বুড়ির কাশিতে তিতি বিরক্ত পরিবারে লোকেরা সেই রাতে আরাম করে ঘুমোয়।

রোগ নিরাময়ের জন্য, রোগীদের দুঃখ-কষ্ট লাঘব করার জন্য জগগু বহু ধরণের গুণের প্রয়োগ করতো—প্রয়োজন মাফিক টোট্‌কা, মন্ত্রতন্ত্র, ঝাড়ফুঁক, মুষ্টিযোগ। কিন্তু প্রতিটি গুণ প্রয়োগের আগে সেই সম্পর্কে অন্ততঃ আধ-ডজন গপ্প সে নিশ্চিত শোনাতো!

গপ্পো, রোগ পরীক্ষা, রোগ-নির্ণয়, টোটকা আর মুষ্টিযোগ দুই শ্রেণীর ছিল। এক ভব্য অন্যটি অভব্য। অভব্য রোগে কি আর ভব্য টোটকায় কাজ হয়? গপ্পো-টপ্পো, সব ধরন-ধারন পরখ করেই শোনায়। সচরাচর প্রতিটি গল্পে 'গ্রাম্যরস' কিছু বেশী পরিমাণেই মেশাতো সে।

কোমরের ব্যথার জন্য রোগী রোববারের উষার প্রথম লগ্নে উঠে তালগাছকে কোলে জড়িয়ে ধরে আদর করবে। অমনি ব্যথা একেবারে ফু-র-র-র! শর্ত হলো, অন্য কেউ তা দেখবে না, কিংবা আওয়াজ দেবে না।

কর্ণমূল প্রদাহে (মাম্‌স্‌) কাঁকুড় গাছের কাছে বসে প্রদীপ ধরাবার আগে ডুকরে-ডুকরে কাঁদবে। সঙ্গে-সঙ্গে বেগুনের মতো ফোলা গাল চুপ্‌সে বটুয়ার মতো হয়ে পড়বে।

কিছু-কিছু টোটকা শুধু কানে-কানেই বলা চলে।…অভব্য রোগের কোন অভব্য টোটকা!

। ৩ ।

পনরো বছর আগে, ষ্টেশনের কাছে ম্যালেরিয়া সেণ্টার খোলে। সরকারী ডাক্তার-কম্পাউণ্ডার ছাড়াও কিছু ডাক্তার (হোমিও আর অ্যালো) এসে গাঁয়ে বসবাস শুরু করে। এ ছাড়াও কিছু প্রতিভাবান 'ক-অক্ষর গোমাংস' ছেলেও ছিল যারা মিডল্‌ পরীক্ষায়

পাশ বা ফেল করে ঘরে বসে ডাক্তারী পাস করে, লাঠির জোরে ডাক্তারী চালাতে থাকে।—কোয়াক!

জগ্‌গু জনৈক শিক্ষিতের কাছ থেকে কোয়াকের অর্থ জেনে নিয়েছিলো।

তাই যখন সরকারী ডাক্তার-কম্পাউণ্ডার-রা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তার সময় জগ্‌গু কে 'কোয়াক' বলে অভিহিত করে, সে সঙ্গে সঙ্গে বিরোধিতা করে বলে—না হুজুর! গুরুর কৃপায় যা কিছু আমার মধ্যে আছে, তা গুরু-মুখ থেকেই পেয়েছি—'কোয়াক' বলবেন না, ডাক্তার বাবু।

এতো ডাক্তার-কম্পাউণ্ডারের এখানে আসা স্বত্বেও জগ্‌গুর প্র্যাকটিসে কোন তফাৎ পড়েনি। সকলেই দেখে, ডাক্তারদের গৃহিনীরাও তাঁদের বাচ্চা বা নিজের ওষুধের জন্যও জগ্‌গুর কাছেই ছুটে যাচ্ছেন। হাটবারে, হাটের চৌরাস্তার ওপর চট দিয়ে দোকান সাজাতো। কাপড়ের টুকরো দিয়ে বহু ধরণের ছোট-ছোট নানারঙের থলে তৈরী করতো, প্রতীক্ষারত লোকেরা তার দোকানের চারদিকে এসে জড়ো হতো। দেখতে-দেখতে ভিড় জমে যেত।···হাটের ভিড়ের মধ্যেও নাড়ী দেখতে কখনো গোলমাল করেনি জগ্‌গু পান্সারী।

হাটেই রোগ পরীক্ষা, সঙ্গে-সঙ্গে ওষুধও।

হাটে তার গল্প-বলার কৌশল তো নয়, কিন্তু *শব্দ*-বাছাই'র এক অদ্ভুত চাতুরী সে কাজে লাগাত!

কেউ একজন হাত দেখাচ্ছে। অন্য জন পথ্যের কথা জিজ্ঞেস করছে। তৃতীয় স্ত্রীলোকটি ঘোমটার আড়াল থেকে নাকী সুরে ক্রমাগত কিছু বলে চলেছে। অথচ, জগ্‌গু সবার কথাই শুনছে—শুনছে। কখনো গোলমাল হয়নি। সকলকে একই সঙ্গে সঠিক ওষুধ আর উপযুক্ত উপদেশ দিয়ে চলেছে।—পেট? পেট অপরিষ্কার? অ্যাঁ? ঠিক কিনা? ক্ষিদে? ক্ষিদে নেই? ঠিক? মুখ তিতকুটে আর পেচ্ছাপ কুটকুটে? তাই তো?···চিরতা বেটে পাচন ভোরে।

বুঝেছো ? আর জিরে, বিটনুন গুঁড়িয়ে দইয়ের ঘোলে…চার আনা ভাগ চিরতা। হাত বাড়ান।…কি মা! হ্যাঁ—রাতদিন মাথা ভারি ? তাইতো ? প্রতি মাসেই অসুখ,—আর পারি না। অ্যাঁ ? তাইতো ? চোখের সামনে ওড়ে জোনাকি—কানের কাছে ভোঁ-ভোঁ ফাঁকি ? তাই কিনা ?…অশোক ছালের পাচন সঙ্গে ছাড়া-দুধের নাচন · এই তুতে কার ভাই—এই নিন নীল শেকড়…আদার সঙ্গে কালো মৌরী ! পুরনো মধু, কালো গাইয়ের চোনা শুধু !

॥ ৪ ॥

গাঁয়ে পোঁছে দেখলাম শুধু কুসুমলাল-ই নয়, জগ্‌গুর আলোচনায় সকলেই বেশ রসালো কথা শুরু করে। হাতের 'যশ' এবং কথার 'সত্য' যেন লোকেরা স্বচক্ষে দেখেছে—একজোড়া পাখির মতো ফুর্‌র্‌ করে উড়ে গেল।…এখন আর জগ্‌গুর কাছে আছেই বা কি ?

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো, রসিকলাল গোটা অঞ্চলে রসালো গপ্পো—বাপের বিষয়ে—বলে বেড়ায়। নিত্যি-নতুন কাহিনী !

রসিকলালকে দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। সে নিজেকে ডাক্তার রসিকলাল বলা ও শোনা পছন্দ করে। পেটেন্ট ওষুধের এজেন্সি নিয়েছে। সাইনবোর্ডের ওপর লেখা—'হাজার রোগের একমাত্র ওষুধ 'রামবিন্দু'—ডাঃ রসিকলাল, ঘর-হলদিয়া'র কাছে পাবেন।'

গল্প রসিকলালও শোনায়। কিন্তু তার সব গল্পই হাল-ফ্যাসানের। গল্পে মাঝে-মাঝে ইংরেজী শব্দ জুড়ে দেয়—ষ্টেশন মাষ্টার সাহেবের বড়ো মেয়ে রোজ রাতে স্বপ্নে খারাপ-খারাপ 'ড্রিম' দেখে ভয় পেত। ড্রিমে দেখত ষ্টেশনের সিগন্যাল কখনো 'ডাউন' আবার কখনো 'আপ' হয়ে যায়।…শুকিয়ে একেবারে কাঠ হয়ে গিয়েছিল। ষ্টেশন মাষ্টার

নয়,—বললো এসে ষ্টেশন মাষ্টারের ঘরনী। তা, এমন টোটকা বাত্‌লে দিলাম, সাহস কি আর কখনো স্বপ্নে খারাপ-খারাপ 'ড্রিম' দেখে। সিগন্যালই বা 'আপ' আর 'ডাউন' হবে কেন!

গল্প-শ্রোতাদের যখন আরো কিছু শোনার ইচ্ছে হতো, তখন আরও কিছু কথা 'যুক্ত' করে তাদের উস্কে দিত কিন্তু, জগগু বলে রসিক হলো ঢোঁড়া সাপ, মন্তরও জানে না। মিছিমিছি সকলকে ঠকিয়ে বেড়ায়।

তখন রসিকলাল বার বার সিগারেট ধরায় ও বিতরণ করে। ধোঁয়া ছাড়তে-ছাড়তে বাপকে একটা নোংরা গালাগাল দেয়। তারপর একটা অশ্লীল গল্প—বাপের সম্পর্কে—শুরু করে। কাল রাতের কথা কি আর বলবো? বারান্দায় উলঙ্গ হয়ে একেবারে ।

সব কীর্তি-কাহিনী শোনার পর মনে হলো, জগ্‌গু এখন পুরোপুরি জানোয়ারে পরিণত হয়েছে। গ্রামবাসীদের কথায় এও জানা গেল যে এর একটা ব্যবস্থা হচ্ছে—গোপনে গোপনে—যাতে জগ্‌গুকে আস্তানা গুটিয়ে এই গাঁ থেকে পালাতে হবে। এই বুড়োটা একেবারে 'ঘিনিয়ে' দিয়েছে।

চল্লিশ বছর আগে যে জগ্‌গু এসে গেড়ে বসেছিলো, এখন সে যাবে কোথায়? নিজের গাঁয়ে? একমাত্র সন্তানই যখন আপন হলো না, গ্রামবাসীরা তো তাকে চিনতে চাইবে না। চল্লিশ বছর আগে যে গাঁ ছেড়ে এসেছিল—সেখানে তার আছেটা কি?

জগ্‌গুর সঙ্গে আমার দেখা করার ইচ্ছে ছিলো। ছেলেমেয়েদের জন্য এক শিশি 'হিঙ্গের' হজমী তৈরী করিয়ে শহরে নিয়ে যেতাম।

জগ্‌গুর কুঁড়ে ঘরের কাছেই তার ছেলের বিশাল বাড়ি তৈরী হচ্ছে। রসিকলাল নমস্কার করে ডাকে—আসুন!

আমি জেনে শুনে তাকে জিজ্ঞেস করলাম—তোমার বাবা কোথায়? জগ্‌গু কবিরাজের কাছে দরকার আছে।

রসিকলাল একটু হকচকিয়ে গেল। কুঁড়ে ঘরের দিকে আঙুল

দেখিয়ে বললো—যান, ইংলিশ বায়স্কোপের খেল হচ্ছে হয়তো। দেখুন গিয়ে।

রসিকলাল নিজের কথায় নিজেই হেসে ওঠে।

জগ্‌গুর কুঁড়েঘর আমার চেনা। তার ঘরের বাইরে এমন স্তব্ধতা কখনো দেখিনি। সেখানে হামেশা একটা যেন মেলা লেগে থাকতো।

আমার কাশ শুনে জগ্‌গু আমায় চিনতে পারলো।

দরজার কাছে গিয়ে ডাকলাম।

লালবাবু নাকি? ভেতর থেকে জবাব এলো—আসুন। ভেতরে আসুন।

জগ্‌গুর পাহাড়ি রমনীটির ওপর প্রথমেই চোখ পড়ে—ভেতরের উঠোনে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে। ভেতরে বারান্দার মত জায়গায় জগ্‌গু খাটিয়ার ওপর বসে আছে। পাহাড়ি-রমনীটিকে দেখেই বুঝলাম—কুসুমলাল কেন তাকে 'কড়কড়ে জোয়ান' বলে।

জগ্‌গু নিজের গল্প শুরু করে।

দেখলাম, পুরনো গল্পকার এখনো মরেনি। কিভাবে তার ছেলে বোকামি করলো, কিভাবে জগ্‌গু ওকে মাফ করলো। তারপর, 'গাওনা'র পর দুজনে মিলে তার সঙ্গে কি রকম দুর্ব্যবহার শুরু করলো। এমন কি এই বার্ধক্যেও কালিমা লেপন করলো।···আমার গুরু বলেছিলেন—ছেলেই হোক বা স্ত্রী-ই হোক, যতক্ষণ না 'গুণ' পাবার যোগ্যতা অর্জন করে, তার হাতে কিছু দিও না। ঠিকই বলেছিলেন গুরুদেব! তা, কিই বা দিয়েছিলাম ওকে। দেখুন দেখি, শিশির ওষুধ দিয়ে বেড়াচ্ছে। ওপরে ভগবান আছে। সব দেখছে। যা অল্পবিস্তর ওর হাতে আছে তাও থাকবে না।

আমি বাধা দিলাম—ওষুধ-পত্তর আর হাট-বাজার বন্ধ করে এভাবে রাতদিন বাড়ীতে বসে থাকলে আপনার হাতেও যে 'গুণ' আর থাকবে না। লোকেরা নানা কথা বলছে।···

জগ্‌গুর চেহারা চক্‌চক্‌ করে ওঠে। মুখ লাল হয়ে ওঠে সঙ্গে সঙ্গে।

পাহাড়ি রমনীটি খলে করে কোন ওষুধ বাটছিল—চৌকাঠে বসে। গোড়া থেকে সে আমার দিকে ভাবলেশহীন চোখে মাঝে মাঝে দেখছিলো। এবার সে জগগুর দিকে তাকায়। জগগু চুপ করে আছে। পাহাড়ি রমনীটির ওষুধ বাটা বন্ধ হয়ে যায়। সে উঠে জগগুর কাছে আসে, এবং পাহাড়ি ভাষায় বলে—এই ভদ্রলোক কি নিতে এসেছে? কিছু না নেবার থাকলে·· চলে যেতে বলুন। এখানে কি তামাশা হচ্ছে?

পাহাড়ি-রমনীটি জগ্‌গুর টাক মাথায় তেল মাখাতে থাকে।

জগ্‌গু বলে ওঠে—লালবাবু! গাঁয়ের লোকেদের কথা আপনিও বিশ্বাস করেন?···আপনি অনেকদিন পর গাঁয়ে এসেছেন। তবে শুনুন!

—আমার হাতের গুণ আমার মৃত্যুর পরেও আমার হাতেই থাকবে। তারপরেও আমার বংশে—আমারই সন্তানের হাতে এই গুণ থাকবে। আমার ছেলের নাম হোল ইণ্ডিয়ার বাইরেও···।

আমি বললাম—'কিন্তু, রসিকলাল তো ।'

শুনে জগ্‌গু একেবারে লাফিয়ে ওঠে—ওর কথা আর বলবেন না বাবুসাহেব। ও আমার ছেলে নয়। সত্যি, আমার ছেলে নয় ও।

—তাহলে? আপনি যে বললেন···।

—কি বললাম?

জগ্‌গু উত্তেজিত হয়ে ওঠে—রসিকলাল আগে নিজের বাঁজা বৌ-য়ের চিকিচ্ছে করুক। বাবুসাহেব, আমি মাটির ওপরে তিনটে দাগ কেটে বলছি, মাথার ঘাম পায়ে ফেললেও ওর বৌয়ের গর্ভ থেকে একটা ইঁদুরও বেরোবে না।

—যাই হোক, সে তো আপনারই ছেলে।

—আবার সেই কথা! লালবাবু, ও আমার ছেলে নয়। আমার···! পাহাড়ি-রমনীটি, যে এতক্ষণ ধরে জগ্‌গুর মাথায় তেল মাখছিল, তার আঁচলটা তুলে হাত দিয়ে পেট স্পর্শ করে জগ্‌গু বললো—আমার ছেলে এখানে আছে। এখানে—।

আমি যেন সহসা বোবা হয়ে গেলাম। পাহাড়ি রমনীটি আগের মতই জগ্‌গুর মাথায় তেল মাখতে থাকে। তার চোখে-মুখে কোন পরিবর্তন নেই। না লজ্জা না রাগ।

—লোকে বলে জগ্‌গুর হাতে এখন আর যশ নেই। দেখবে, লোকেরা দেখবে। বুঝলেন লালবাবু আমার এই কাঞ্চীকে ফারবেশগঞ্জ মিলের বজ্জাত মজুরেরা চার বছর এক নাগাড়ে নিজেদের কাছে রেখেছে। নানারকম বিলিতি ওষুধ খাইয়ে ওর সন্তান ধারনের ক্ষমতাই নষ্ট করে দিয়েছিল। আমার কাছে যখন এলো, প্রথমে ভাবলাম সে রক্ষিতার মত থাকবে। কিন্তু বাবুসাহেব, এ রমনী সামান্য স্ত্রীলোক নয়—সাক্ষাৎ সতীলক্ষ্মী। তাই রসিকলাল যখন নিজের চাল-চলন বিগড়ে ফেললো—ভাবলাম, আর নয়···।

আমি লক্ষ্য করে দেখলাম, জগ্‌গুর স্বাস্থ্য আগের চেয়ে ভালো হয়েছে।

—বাবুসাহেব, পাঁচমাস ধরে শুধু ওর গর্ভ 'শুদ্ধি' করেছি। আপনি তো জানেন, আমি সমস্ত রকম রোগের ওষুধ দিতাম। কিন্তু গর্ভ আর গর্ভধারণের গোলমাল সংক্রান্ত 'কেসে' পরিষ্কার জবাব দিয়ে দিতাম। কারণ, গুরু বলেছিলেন সন্তান দেওয়া না-দেওয়া সব বিধাতার হাতে। যে কবিরাজ বিধাতার এই ক্ষেত্রে নাক গলায়—তাকে বিধাতা একদিন প্রশ্ন করেন।·· তা, যখন মন মজে গেল তখন কিবা হাঁড়ি কিবা ডোম। · বাবুসাহেব, ঐ শালারা একে দোহন করে-করে শরীরটাকে একেবারে ঢিলে করে দিয়েছিল, তাই এর গর্ভশুদ্ধির পর ঢলঢলে শরীরের চিকিচ্ছে শুরু করলাম।···বলুন তো, কাঞ্চীর বয়স কতো হবে? দেহের এই যে গড়ন দেখছেন না—এসব ওষুধ খাবার পর হয়েছে ।

জগ্‌গু থামে। আমি ভয় পাই, পাছে পেটটা দেখানোর পর যদি আবার কিছু !

আমি বলি—হিঙের হজমী তৈরী আছে?

—লালবাবু, হজমী-টজমী আর নয়। আজকাল আমি আর ওসব মামুলি ওষুধ করতে অহেতুক সময় নষ্ট করি না। তা, কাঞ্চীর যখন গর্ভ শুদ্ধ হলো—একেবারে পিওর হয়ে গেল—আমি তখন গুরুকে স্মরণ করে কাঞ্চীকে ঘরে তুললাম। শুধু হাতের 'যশ' আর কথার 'সত্য' আমার বংশে বাঁচিয়ে রাখার জন্য।—আপনি জানেন, বিজু আমের চেয়ে কলমি-গাছের আম ভালো হয়। কিন্তু কলম লাগানো বড়ো কঠিন কাজ।—

আমি এবার উঠতে চাইছি। কারণ, জগ্‌গুর পাহাড়ি রমনীটি টাকে-মাথায় তেল মালিশের পর—তার কোমরের দিকে হাত বাড়িয়েছে।···ঢিলে খাটিয়াটা থেকে-থেকে মড়মড় করে উঠছিলো, পাহাড়ি রমনীটি প্রতিবার 'আইয়ো' বলে জগ্‌গু কে বলছিলো—'পুগ্যো!'

—তা, লালবাবু! সবকিছু শুদ্ধি করে কাঞ্চীকে যখন ঘরে তুললাম, ঐ হারামজাদা কি করলো জানেন?—আমি ফারবেশগঞ্জে গিয়েছিলাম, আর ঐ ফাঁকে ঐ শালা আবার 'অশুদ্ধ' করে দিলো। —আজ্ঞে হ্যাঁ, ঐ রসিকলাল! ঘরে ফিরতে কাঞ্চী বললো—আবার

এবার আমি উঠে দাঁড়ালাম।—আমি নিজে আপাদ-মস্তক অশুদ্ধ হয়ে উঠছিলাম।

—বাবুসাহেব, শুনে যান।—কাঞ্চীর পেটে যে বাচ্চাটা রয়েছে, সে একদিন এ গাঁয়ের সমাজের, হোল ইণ্ডিয়ার নাম রাখবে।—কাঞ্চী যেদিন সকাল-সকাল উঠে বমি করলো—সেদিন থেকে আমি রাতদিন বাড়ীতেই থাকি। কোথাও যাই না। যাব কি করে? ছ-মাস পর্যন্ত 'বাচ্চার' ওপর কারো ছায়া পড়তে দেবো না। এখন সবে দু-মাসের।—হ্যাঁরে কাঞ্চী, আজ 'শিমুলাকন্দ' খেয়েছিস তো? তোর খেয়াল নেই বেচারা বাচ্চা—?

জগ্‌গু আবার কাঞ্চীর পেটের ওপর থেকে আঁচল সরিয়ে ধরলো

—দেখছেন লালবাবু, একে বলে হাত যশ! রসিকলালের বৌ পাবে কোথায়!

আমি উঠোন থেকে বাইরে বেরিয়ে এলাম।

আগুন-খেকো

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

সূর্যনাথ বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। স্ত্রী বাধা দিল, 'কোথায় যাচ্ছ? দশটায় আভার ছেলে আসবে।'

সূর্যনাথ পাঞ্জাবীর বোতাম আঁটছিল। তার হাত থেমে পড়ে। মনে পড়ে। কাল রাতে বাড়ী ফেরার পর স্ত্রী বলেছিল, 'জানো, আজ হঠাৎ বাজারে আভার ছেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—ওমা? আভাকে মনে নেই!—তোমার আদরের আভারানী রায়। আর, ওর ছেলে মানে, সেই ছেলে!'

সূর্যনাথ জিজ্ঞেস করেছিল, 'দেখতে কেমন হয়েছে?—মানে কার সঙ্গে চেহারাটা মেলে। অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভার, নাকি ঐ কাপড়ের দোকানের বুড়ো মালিকের সঙ্গে—?'

স্ত্রী বলেছিল, 'আমি অতটা খেয়াল করে দেখিনি। কাল সকালে দশটায় সে আসবে। দেখে মিলিয়ে নিও, কার সঙ্গে মেলে কার সঙ্গে নয়।'

'কিন্তু তুমি যে বাইরে বেরুচ্ছো।' পাঞ্জাবী খুলতে খুলতে সূর্যনাথ বলল।

সে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসছে। বলছিল, ওঁকে একটা ইনফরমেশান দেবার আছে। সে হাসতে হাসতে বলে, জানো! ঐ ছেলে কাল আমায় অদ্ভুত ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিয়েছিল, কিছুক্ষণের জন্য। হঠাৎ, না জানি কোত্থেকে এসে মাঝ-রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে—

'আপনি অন্নপূর্ণা মাসী না? আমায় চিনতে পারছেন, কে বলুন তো—' তারপর সে নিজেই বলে, 'চিনবেন কি করে? কখনও দেখেন নি যে। আমি আপনার আভারানীর ছেলে—' আমি তো অবাক!

'আপনার আত্মরে আভারানী বলে নি?' সূর্যনাথ ব্যঙ্গ করে।

অন্নপূর্ণা ওয়ার্কিং উইমেন্স এসোসিয়েশনের নামে গাদা চিঠিপত্র ব্যাগে রাখতে-রাখতে বলে, 'আমার, নাকি তোমার আত্মরে?'

'তোমার।'

'বাজে কথা বলো না।' অন্নপূর্ণা অর্থপূর্ণ হাসি হেসে বাইরে বেরিয়ে যায়। যেতে-যেতে বলে, 'ছেলেটা প্রথম বার আসছে। ঘরে বিস্কুট আছে, মিষ্টিও—জলখাবার দিও।'

স্ত্রী চলে যায়। সূর্যনাথের মনের পর্দায়, সতরো-আঠারো বছর আগেকার বহু স্মরণীয় ঘটনা, মুহূর্ত এবং ক্ষণের ছবি 'ফ্ল্যাশ-ব্যাকের' মত ফুটে উঠতে থাকে—

—সেবার অন্নপূর্ণা মেটরনিটি সেন্টারের অনারারী সেক্রেটারী নির্বাচীত হয়েছিল। তা, বাড়ীতে প্রায়শ লেডি হেলথ ভিজিটার, নার্স, মিডওয়াইফ এবং ট্রেনিং-আগত মেয়েরা আসত। পরে অন্নপূর্ণা তাদের বারণ করে দিয়েছিল।

—কিন্তু, আভারানী রায় যখন সেন্টারে ট্রেনিং নেয়ার জন্যে ভর্তি হয়, অন্নপূর্ণা নিজে তখন তাকে সঙ্গে করে বাড়ীতে নিয়ে এসেছিল একদিন, নাও, এবার যত পারো শুনবে বাংলা কীর্তন—এ হলো আভারানী রায়! আমাদের সেন্টারে ট্রেনিং নিতে এসেছে। রিফুজী নয়, বেচারা 'উইডো'! খুব সুন্দর কীর্তন গায়।'

'শ্যামা কীর্তন না—?' সূর্যনাথ জিজ্ঞেস করে, আভারানী মৃদু স্বরে জবাব দিয়েছিল, 'কৃষ্ণ-কীর্তন!'

সূর্যনাথ চোখ তুলে গভীরভাবে আভার ললাট দেখেছিল।

পূর্ণ যৌবনে বিধবা হওয়া তার পরিচিত কয়েকজন মেয়ের ললাটও ঠিক এমনি—কিন্তু চেহারায় প্রচুর লাবণ্য দেখে সে বলেছিল, 'যথাযোগ্য নাম আপনার।'

অন্নপূর্ণার আগে, সূর্যনাথের বক্তব্যের অর্থ আভা-ই বুঝেছিল। সে সামান্য অপ্রতিভ হেসে বলেছিল, 'আপনি কবি মানুষ—আপ কবি ঠহরে।'

'কে বলেছে আমি কবি? শ্রীমতি অন্নপূর্ণা বুঝি?'

অন্নপূর্ণা হাসতে হাসতে এগিয়ে আসে, 'না, কবি নয়, আমি সাহিত্যিক বলেছিলুম।'

'একই কথা—এক হি বাত হ্যায়।'

'একই কথা' বলার সময় আভারানী তার ডান চোখের পাতা এমন ভাবে মারে, যা শুধু সূর্যনাথ-ই দেখেছিল এবং বুঝতে পেরেছিল।

আভা চলে যাবার পর অন্নপূর্ণা বলে, 'বিধবা নয়, বেচারী পরিত্যক্তা। স্বামী ছেড়ে দিয়েছে···'

সূর্যনাথ ঠিক আভারানীর মত ডান চোখের পাতা টিপে বলেছিল, 'একই কথা।'

'কি করে এক কথা হলো?'

'যদি স্বামী ওকে না ছাড়ত, তাহলে বেচারা মরেই যেত, আর ও বিধবা হয়ে পড়ত।' সূর্যনাথের বলার ভঙ্গিমায় এমন মনে হল যে সে আভাকে খুব ভাল করে চেনে। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞেস করে বলেছিল, 'তুমি কি আগে থেকেই জানতে ওকে? ওদিকেই কোথায়, মানে···। পূর্নিয়া-সাহারসার দিকে থাকে কোন এলাকায়···'

'যেখানকার হোক না! এ কারো বউ হয়ে থাকার জন্য জন্মায় নি। দেখলে না, কেমন 'সখী সখী' ভাব স্বভাবে। এ কারো 'সখী' হয়েই থাকতে পারে।' বলে সূর্যনাথ হেসে উঠেছিল।

স্বামীর এমন কুটিল হাসি দেখে অন্নপূর্ণার সন্দেহ হয়েছিল, নিশ্চয়ই কোন 'অসভ্য' কথার দিকে সংকেত করেছে, 'মানে?'

'মানে বুঝতে হলে তোমায় সম্পূর্ণ 'বৈষ্ণব সাহিত্য' শোনাতে হবে।'

'সখী হয়েই থাকতে পারে—এর অর্থ কি ?'

সূর্যনাথ বুঝতে পারে, অন্নপূর্ণার কি ব্যাপারে শঙ্কা হচ্ছে, তার হোস্টেলের দিনের সখী অলিভ ডাইসন-কে স্পর্শ করে, বলা হয়েছে। এবং এমন ব্যাপারে গন্ধ পেয়েই সে এমন রেগে ওঠে যে সূর্যনাথ ঘণ্টার পর ঘণ্টা সাধাসাধি করে, নানান ধরণের শপথ-প্রতিজ্ঞা করেও তার মান ভাঙ্গাতে পারে না। এইজন্য সে সহজ ভঙ্গিতেই বলেছিল, 'সখীর অর্থ বন্ধু তো ? আমার কথার অর্থ এই 'ধরনের' মেয়েরা পুরুষের সঙ্গে বন্ধু ভাবেই থাকতে পারে।'

অন্নপূর্ণা সে-রাতে তাড়াতাড়ি সহজ হয়ে পড়েছিল। কিন্তু, সে আরেকটা প্রশ্ন করে, 'তুমি এ কথা বললে কেন যদি স্বামী এঁকে না ছাড়তো, তাহলে বেচারা মারা পড়তো· ·'

'কপাল দেখে বলেছিলাম।'

'হুঁ, খুব যে জ্যোতিষী ফলাচ্ছো।'

'ত্রিভুজাকার, প্রশস্ত ললাট এবং উজ্জ্বল সিঁথি···এবং এমন শরীর যার গড়ন, তারা সাধারণতঃ বেশী 'এনারজেটিক' হয়ে থাকে—মত্তা, প্রমত্তা, অতিমত্তা, মহামত্তা !'

'ও ! আভা যে 'কবি-মানুষ' বলেছিল, তার তাৎপর্য তুমি বুঝেছিলে ?'

'কবি মানুষ মানে রসিক পুরুষ।'

'আজ্ঞে না, তার তাৎপর্য এ ছাড়াও—এর পরেও কিছু আছে··· সাহিত্যিকরা কিছুটা চরিত্রহীন হয়ে থাকে, দুনিয়া শুদ্ধ্ লোকেরা জানে।'

'কিছুটা নয়, সম্পূর্ণ।' সূর্যনাথ অ্যাপ্রুভারের ভঙ্গিমায় কবুল করে।

সেরাতে অনেকক্ষণ ধরে তারা দুজনে পরস্পরকে কাতুকুতু সুড়সুড়ি দিয়ে হাসিয়ে চটিয়ে জেগে কাটায়···

…এবং 'হরিসভা'র সেই রাত!

প্রথমবার 'হরিসভায়' আভারানীর কীর্তন শুনে সূর্যনাথ এবং অন্নপূর্ণা বস্তুতঃ মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু, আভা যখন তাদের বাড়ীতে এসে কীর্তন শোনাবার ইচ্ছে প্রকাশ করে, অন্নপূর্ণা রাজী হয় না, 'কীর্তন এবং ভজন হরিসভা বা ঠাকুর-দালানেই শুনতে ভাল লাগে।'

অন্নপূর্ণার চালাকী চতুর আভা ধরে ফেলেছিল, মনে-মনে দাঁতে-দাঁত চেপে চুপ করেছিল।

একদিন আভা বাজারের থলে হাতে ঝুলিয়ে আসে, 'দিদি… আমি দিদি এবং জামাইবাবুকে এক বিশেষ 'মেনু' করে খাওয়াতে এসেছি। উইথ ডিউ রেসপেক্ট আই বেগ '

সেদিন আভা অনেক যত্নে 'মালাইকারী' রেঁধে সূর্যনাথ এবং অন্নপূর্ণাকে চাখিয়েছিল। সূর্যনাথ চাখতে চাখতে জিভে—শব্দ তুলে কিছু বলার ভঙ্গি করে। অন্নপূর্ণা অনুরাগ-মিশ্রিত ঝাঁঝি দিয়ে উঠেছিল, 'আমি জানি, তুমি কি বলতে চাও। বলবে—'চমৎকার,' তাই না?'

'না, একেবারে নয়। আমি বলতে চাইছি, 'ভীষণ সুন্দর,' কিন্তু তুমি যখন বাধা দিলে, আমি বলব, 'অপূর্ব…'

কাঁচা নারকেল বেটে দুধ বার করে, তাতে রুই মাছের কাঁটাশূন্য খণ্ড…সূর্যনাথ বাঙ্গালী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভাষায় বলেছিল, 'আহা! এ তো ক্ষীরসাগরে স্বয়ং ভগবান মৎস্যাবতার· '

'জামাইবাবু! আপনি শুধু রসিকই নয়, সুরসিক।

'সুরসিক না ছাই, ভোজন-বিলাসী আর পেটুক। একবার দিল্লীতে এরকম আকণ্ঠ ঠেসে—'

সূর্যনাথ ঢেকুর তুলে বলেছিল, 'অবস্থী'র বাড়ীতে? হ্যাঁ, এরকমই ভূরি-ভোজন—আর, সেখানেও নানান পদের ব্যঞ্জন ও ভোজ্য পদার্থ অবস্থির শালী রেঁধেছিল। ঠিক এরকম পরিবেশন

করে খাইয়েছিল—সেবারেই অবন্তী বলেছিল, সংস্কৃতে শালীকে কেলিকুঞ্চিকা বলা হয়।'

অন্নপূর্ণা হেসে বলেছিল, 'সাবধান, আভা!'

হাসির অনুরননে সুপারইমপোজ হয়, বর্ষার রাত।

—ভিজতে ভিজতে আভা একা এসেছিল, 'দিদি! দিদি নেই বুঝি বাড়ীতে?'

সূর্যনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'একি! আপনি যান নি? —আপনাকে সঙ্গে নিয়ে যায় নি অন্নপূর্ণা? আজ ওয়ার্কিং উইমেন্সের জন্য 'চ্যারিটি-শো আছে না।'

'আজ আমার 'আফটারনুন-ডিউটি' ছিল। আমি একেবারে ভিজে গেছি জামাইবাবু—'

বাথরুম থেকে অন্নপূর্ণার সাড়ি আর ব্লাউজ পরে আভা বাইরে আসে। সূর্যনাথ হাতে করে চায়ের পেয়ালা নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, চা নয়। গুলবগসফার ক্বাথ, আদা এবং লেবুর রসে মেশানো—সাংঘাতিক ফ্লু ছড়িয়েছে, চারদিকে। ঢক্ঢক করে গিলে ফেলুন, নিশ্চিন্ত থাকুন—'

আভা জিভে চেখে দেখে, সত্যি ক্বাথ। সূর্যনাথ জিজ্ঞেস করে বসে, 'আপনি কিসের সন্দেহ করছেন? বলুন না—'

'শুনুন, আপনি আমায় 'আপনি-আপনি' কেন বলেন?' আভা ফোঁস্ করে বলেছিল।

'আপনার সন্দেহ হয়েছিল চায়ে কোন নেশা মিশিয়েছি কিনা?'

'আপনাদের বিশ্বাস কি! আপনারা' সব কিছু করতে পারেন।' সে জখম করা হাসি হেসে সূর্যনাথকে দেখতে থাকে।

'কিন্তু, আপনার সাহস তো কম নয়।'

'আমায় 'আপনি' বললে, কোন জবাব দেবো না।'

সূর্যনাথ ওর পাশে এসে বসে পড়ে। সে মাথার চুল পিঠের

ওপর ছড়িয়ে দিয়ে শুকোচ্ছিল। আভা সহসা জিজ্ঞেস করে বসে, 'সত্যি সত্যি চায়ে অন্য কিছু মেশান নি আপনি ?...তাহলে আমার শরীর এমন ঝনঝন করছে, কেন ? মাথা ঘুরছে।'

সূর্যনাথ 'রুটি'তে গুলবনসফা, লেবু এবং আদার রস ছাড়া আর কিছু মেশায় নি। এ স্বত্ত্বেও যদি আভার নেশা চেপে ধরে, তাহলে সূর্যনাথ তাকে বিশ্বাস করার চেষ্টা কেন করে ?

'আভারানী।'

আভা সফল অভিনেত্রীর মত সূর্যনাথের কাঁধে মাথা রাখে। সূর্যনাথের শরীর সহসা তপ্ত হয়ে উঠেছিল। স্বচালিত যন্ত্রের মত তার হাত ছুটি আভাকে জড়িয়ে ধরেছিল। বাইরে আকাশে বিদ্যুৎ চম্‌কে ওঠে। মেঘ গর্জন করে ওঠে, এবং সূর্যনাথের তপ্ত শরীর সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে পড়েছিল। সে ছিটকে আভার কাছ থেকে পৃথক হয়ে পড়েছিল। আভা অস্ফুট স্বরে বলেছিল, 'কেউ নয় বাতাসে জানালার দরজা খুলে গেছে। সূর্যদা...জামাইবাবু...আপনি কোথায় গেলেন ?'

এই ঘটনার পর আভা সূর্যনাথের সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দেয়। এবং কয়েকদিন বাদে অন্নপূর্ণা তাকে বাড়ীতে আসতে বারণ করে দেয়। পাশের বাড়ীর বুড়ী ঝি ফিসফিস করে অন্নপূর্ণাকে বলেছিল, 'উঁ ছোঁড়িয়া 'ছিনার' হ্যায় বহুজী। ঘর মে উসকী 'আওয়াজাহী' বন্ধ কর দো...'। ঐ ছুঁড়িটা ছেনলি, বৌমা! বাড়ীতে ওর আসাযাওয়া বন্ধ করে দাও...

অপমানিতা আভা নিজের বদলি মঙ্গলতালাও সেণ্টারে করিয়ে নেয়। এরপর যখনই অন্নপূর্ণার সেণ্টারে কোন কাজে যেত, অন্নপূর্ণাকে নমস্কার ওব্দি করতো না।

দশ-এগারো মাস পরে এক বিকেলে হঠাৎ আভা এসে হাজির। অন্নপূর্ণার পা ছুঁয়ে প্রণাম করে। অন্নপূর্ণা খুশী হয়ে বলেছিল, 'পাশ করেছো ত ?'

আভা মাথা ঝুঁকিয়েই জবাব দিয়েছিল, 'হ্যাঁ, দিদি!'

সে রাতেই অন্নপূর্ণা সূর্যনাথকে বলেছিল, 'তুমি ঠিকই বলেছিলে। ওমা, এই মেয়ের সাহস দেখেছো। ছ মাসের পেট নিয়ে লজ্জা-ভয় ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছিঃ ছিঃ এখন খসাতে চাইছে। কাঁদছিল কোন রকমে 'উদ্ধার' করে দিন···বকুনি দিয়ে না সরালে, এখনও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ভুন্‌ভুন্‌ করে কাঁদতো।

সূর্যনাথ বলেছিল, 'অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারের সঙ্গে আমি কয়েকবার ওকে সিনেমা হলে দেখেছি···'

অন্নপূর্ণা বলে, 'ও বলছিল কাপড়ের দোকানের বুড়ো মনিব ফুসলে নিয়ে ওর সর্বনাশ করেছে···'

সূর্যনাথ কিছু বলতে চাইছিল। কিন্তু অন্নপূর্ণা বলে চলে, 'ভালো হয়েছে বলতে হবে ও নিজের বদলি করিয়ে নিয়েছে, নইলে না-জানি আর কার-কার নামে বদনাম করত।'

সূর্যনাথের ইচ্ছে স্বত্বেও কিছু বলতে পারে না। অন্নপূর্ণা এক ধরণের উদাসী হাসি হেসে বলেছিল, সেই যে গান গাইত—'মরিব সখী নিশ্চয় মরিব ··' এবার সত্যি মরবে হতভাগী।'

কিন্তু আভারানী রায় মরে নাই। হোলি ফ্যামিলী হসপিটালে পুত্র-রত্ন জন্ম দিয়ে, জানি না কোথায় চলে গেল। 'মাদারের' নামে একটা চিঠি লিখে গিয়েছিল···

···এবং, আভারানীর সেই ছেলে আজ সূর্যনাথকে এক প্রয়োজনীয় সংবাদ দেবার জন্যে আসছে।

সূর্যনাথের মনের পর্দায় লাবণ্যময়ী আভারানীর মুখ ফুটে উঠে স্থির হয়ে পড়ে। এবং পটভূমি কীর্তনের আলাপে মুখরিত—'আমার·· সকলি···গরল···ভেল···'

'গেঁ-এ-ক্‌-গেঁক্‌-গেঁক·· গঁ-এ-ক্‌··· !'

ঘণ্টি অস্বাভাবিক সুরে বেজে ওঠে। মনে হয়, কেউ যেন খেলা করছে। সূর্যনাথ বিরক্ত ভঙ্গিমায় দরজা খোলে। ঘণ্টির বোতাম

আগের মত টিপে-টিপে বাজিয়ে চলেছে, এবং সে হাসছিল, 'হাউ'জ ফ্যাণ্টাসটিক !···আমি আভারানীর ছেলে।

'ভেতরে চলে আস্থন।'

'শ্যামলা রঙ, রোগা-পাতলা শরীর, মাঝারী উচ্চতা এবং ছড়ানো খয়েরী চুল এবং মুখশ্রী ঠিক আভারানীর···ঠিক, আভারানী ছায়া পড়েছে তার ছেলের উপর।

ভেতরে ঢুকে সে বলে—'আমি পা কিংবা হাটু অথবা অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করে কাউকে নমস্কার করি না। আসলে আমি কাউকে অভিবাদন করিই না। আপনি এটা ভাল মনে করুণ অথবা খারাপ—কিছু এসে যায় না। আইক্···স্লা!'

সূর্যনাথের পেছন-পেছন সে বৈঠকখানায় যায়। ঘরে ঢুকেই সে অট্টহাস্যে ফেটে পড়ে, 'মশাই···আপনি এমন তৈরী হয়ে—সেজেগুজে বসে আছেন যেন কেউ আপনার 'সচিত্র ইণ্টারভিউ' নিতে আসছে—আইক্-স্লা—এদিকে নাগাড়ে আপনার কথাবার্তা সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়েছে! একঘেয়ে মনে হয়নি, বোধহয়? কিন্তু আমি আপনার কোন···আইক-স্লা—সাহিত্যিক অথবা সংবাদপত্রের সাক্ষাৎকার নিতে আসিনি। এবং, আপনার এবং আপনার জেনারেশানের ভূষিমাল আইক-স্লা—সাহিত্য আমি পড়ি না। কিন্তু না পড়েই বলে দিতে পারি আপনার গোটা জেনারেশন মরে গেছে···কমার্শিয়াল লেখা আমি পড়ি না। ইটস্ নসিয়েটিং—আইক-স্লা—তা আপনি নিরাশ হবেন না। আমি আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছি শুধু।'

সূর্যনাথ অপ্রতিভ হয়েও হাসবার চেষ্টা করতে থাকে! সে জিজ্ঞেস করে—'আপনি মাঝে-মাঝে ঐ একটা শব্দ ··'আইক-স্লা' কি ব্যাপার···?'

'এটা আমার ব্যক্তিগত শব্দ-ভাণ্ডারের শব্দ, যার অর্থ কিছু একটা হতে পারে।' সে সোফায় বসতে-বসতে লঘু ভাবে বলে।

সে ঘরের দেয়ালে দৃষ্টি দেয়, তারপর কুটিল হাসি হেসে বলে

ওঠে, 'হাউ ডিসগাসটিং—আইক-স্লা—আপনি দেখছি নিজের ছায়াছবি, অভিনন্দন পত্র, উপাধি, 'সার্টিফিকেট-অফ মেরিট' এর বেশ ভালো এক্সিবিশন করে রেখেছেন…ঘরে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে আগন্তুককে আপনার ব্যক্তিত্ব চিতাবাঘের মত লাফ দিয়ে চেপে ধরে নিশ্চয়ই। তাই না? উদ্দেশ্য এটাই। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করি? আপনার নিজের এসব 'ভালগার' মনে হয় না?'

সূর্যনাথ সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়, একেবারে নয়।'

'আইক-স্লা—কেন মনে হবে? পেশার প্রশ্ন তো। কমার্শিয়াল লেখকের অসহায়ত্ব…কিন্তু, আমি আপনার সাহিত্য সম্পর্কে কিছু বলবো না। আর যদি আমি বলতে শুরু করি, আমায় বারণ করে দেবেন।'

সূর্যনাথের ক্রমশঃ অপ্রতিভ চেহারা দেখে তার উৎসাহ বেড়ে চলে। বলে, 'মাসীমা বাইরে গেছেন বুঝি? আমি জানি, উনি আপনাকে একা রেখে প্রায় বাইরে বেরিয়ে যান। আমি সব জানি—আপনার এই ফ্ল্যাট, ইটস্ অ্যান আইডিয়াল প্লেস ফর আত্মরতি—আইক-স্লা!'

সূর্যনাথ খাঁখারি দিয়ে গলা পরিষ্কার করে বলে, 'তা, আপনি আভারানীর রায়ের পুত্র?'

সে লঘুভাবে বলে, 'হ্যাঁ। বর্তমানে, ধানবাদে থাকি। আমার অনেকগুলো নাম। কোন নাম ছদ্ম নয়, সবই আসল নাম। এখন আমি আপনার সঙ্গে সূতপুত্র নামের অনুসারে কথা বলছি।'

সূর্যনাথ হাসার চেষ্টা করেও হাসতে পারে না। সূতপুত্র নিজের বক্তব্যের জের টানে, 'আমার কবি নাম—আইক-স্লা—শিবলিঙ্গা।'

সূতপুত্র শিবলিঙ্গা সূর্যনাথকে জিজ্ঞেস করে, 'আঁৎকে উঠলেন না?'

'আঁৎকে উঠবো কেন? আমার বাড়ীর পাশেই নিজলিঙ্গা সাহেব থাকেন!' সূর্যনাথ সপ্রতিভ কণ্ঠে বলে, 'এখন আপনার আগমনের উদ্দেশ্য বলুন—আইক-স্লা, মানে, দয়া করে!'

সূতপুত্র তেরছা চোখে সূর্যনাথকে দেখে। আভারানী ঠিক এ রকম চোখের পাতা খানিক নামিয়ে দেখত। সে বলে, 'উদ্দেশ্য অতি শুভ। আপনাকে একটা খবর দিতে এসেছি। ব্যস…'

'আপনার মাতৃদেবী…'

সূর্যনাথের মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে সূতপুত্র বলে ওঠে, 'আপনার কেলিকুঞ্জিকা আভারানীর কোন সংবাদ আমার জানা নেই। আমার কাছে জন্মদায়িনীর একটা মোটা ডায়রী আছে—১৯৫৫-৫৬র…হোলি ফ্যামিলি হসপিটালের 'মাদার' যত্ন করে রেখেছিলেন…বুঝেছেন?'

'বুঝেছি আইক-স্লা। এবার সংবাদ শোনান।' সূর্যনাথের কণ্ঠে দৃঢ়তা ফিরে এসেছে।

'সংবাদ জানানোর আগে আমি এটা দেখে নিতে চাই, আপনার মানসিক ধরাতল ঐ সংবাদ গ্রহণ করার যোগ্যতা আছে, নাকি নেই। দেখুন, আমি আপনার লিটারেচার পড়িনি। এজন্য জানা নেই আপনি কোন শ্রেণীর প্রাণী। কিন্তু, আমার জানা আছে, আপনার গোটা জেনারেশান ইললিটারেট অথবা হাফ্ লিটারেট…সবচেয়ে আগে আপনার কৌতূহল মিটিয়ে দিই। ঠিক তো? তা, হোলি ফ্যামিলি হসপিটাল থেকে অনাথালয়, সেখান থেকে টাটা, ঝরিয়া, কলকাতা, সম্বলপুর, এলাহাবাদ নানান জায়গায় আমার শৈশব কাটে এবং যৌবন আসে। লেখা-পড়া যতটুকু হয়েছে, খারাপ হয়নি। কবি, গল্পকার, নাট্যকার এবং শিল্পী হয়েছি। কিন্তু, সেসব আপনার বুদ্ধির বাইরের ব্যাপার। আইক্-স্লা—আমি এখন ধানবাদে আছি এবং ভালই আছি। আনন্দে নিজেকে ব্যবহৃত হতে দিচ্ছি…আপনার বাথরুম কোন দিকে?'

সূতপুত্র ল্যাভাটরীর ভেতরে যায়। সূর্যনাথের সহজ এবং সবল হওয়ার সুযোগ মেলে। সে লক্ষ্য করে, সূতপুত্র এখন 'আইক-স্লা'র ব্যবহার ক্রমশঃ কম করছে।

সূর্যনাথ বুঝে ফেলে—এ ছেলে একটা 'বস্তু' বটে, মানে চালুভাষায় যাকে 'মাল' বলে। এর চুল, পোষাক স্বাস্থ্য সব কিছু 'বিট' এবং হিপিদের বিপরীত। কিন্তু ভঙ্গি সেরকম। সূর্যনাথের হাসি পায়—আমার সঙ্গে সঙ্গে কেমন সাঁই-সাঁই চাবুক মেরে চলেছে, ব্যাটা। হওয়াও উচিৎ—ন্যাচরেলী···

স্নানাগার থেকে বেরিয়ে সে বলে, 'বাথরুম যেসব মাসিক পত্রিকার 'পায়ায়ণ' করেন, তাদের সম্পাদককে লিখে দিন—কিছু 'প্রকৃত সাহিত্য' যেন প্রকাশ করে!'

'আচ্ছা এবার বলুন তো সুইটি শালী আভারানীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক কেমন এবং কত দূর···আইক-স্না···'

'আপনি যে সংবাদ দিতে এসেছেন, আগে তা দিন। আপনি তো আর আমার 'ইণ্টারভিউ' নিতে আসেন নি। তাহলে কিসের প্রশ্ন কিসের জবাব?' সূর্যনাথ এবার চেয়ারে বসে পড়ে।

'আইক-স্না—আমি আগেই বলেছি যে আমি আগে জেনে নিতে চাই···'

'আইক-স্না—আমি আগে আইক-স্না আপনার আইক-স্না খবর শুনে নিতে চাই আইক-স্না! ব্যস!' সূর্যনাথ গম্ভীরভাবে বলে।

সূতপুত্র হেসে ওঠে। সূর্যনাথ লক্ষ্য করে, হাসিতে সামান্য কাপড়ের দোকানের ছায়া ঝলসে ওঠে।

'আচ্ছা? আপনার চুল প্রাকৃতিক কালো? আমি ভেবেছিলুম আপনি বুঝি 'ডায়' করেন। আমার মায়ের ডাঈরীতেও আপনার চুলের অনেক প্রশংসা লেখা আছে। এখন পর্যন্ত এত কালো রয়েছে? আর আপনার দন্তপংক্তি নকল নেটস্ নয় তো? তবে তো এখনও একদশক আরও প্রেমের গল্পের ব্যবসা চালাতে পারেন আপনি। পঞ্চাশ বছরেও এমন ঘন কালো চুল এবং হাড়ের জয়েন্ট কড় কড় করে ভেঙ্গে দেয়া দন্তপংক্তি···আইক্···মানে, ইয়োগা'র

সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে কি? আপনি কি কোন দ্রব্য ব্যবহার করেন?'

সূর্যনাথের একবার ইচ্ছে হয় এই ছোকরাকে সেই করমূলা দিয়ে দিক—চপরকনাতী। নীল পান্‌সে দইয়ে মিশিয়ে···কিন্তু সে জবাব দেয়, 'এটা আমার ট্রেড সিক্রেট।'

অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে সূতপুত্র। সূর্যনাথ চিনে ফেলে, এ নিজেকে 'ফায়ারইটার'—আগুনখেকো মনে করে। 'সেলফ্ পোজড্ লোনলী রিবেল'-এর নকল নমুনা। তার এক লেখকের কথা মনে পড়ে যে বলত—'আই অ্যাম বর্ণ বিফোর মাই টাইম···'

'আপনি করেন কি? মানে রুটি দেয় কে?' সূর্যনাথ অধিকার-গত ভাবে জিজ্ঞেস করে।

'যে আমায় ব্যবহার করে।'

'ট্রেড য়ুনিয়নের সভ্য কি আপনি?'

'আমি আভাগার্দ। আপনি 'অতর্কবাদে'র নাম শুনেছেন?'

'অতর্কবাদ, নাকি কুতর্কবাদ?'

'আপনাকে বোঝানোর জন্য কুতর্ক প্রয়োজন। আমি জিজ্ঞেস করছি আপনি কি উইলিয়াম ব্লেক, জাঁ কক্‌তো, জাঁ জেনে কে জানেন? মেটামরফসিস-এর লেখককে এবং হেনরি মিলার···?'

আমার এসব জানার প্রয়োজন কখনও হয়নি। আমি শুধু এটা জানতে চাই তুই করিস কি?'

'শুনুন, এই তুই-আ-তুই' আমার সঙ্গে চলবে না। আইক-স্না···'

'আইক-স্না।'

'মানে?'

আপনি বলেছিলেন না, এর যা কিছু অর্থ হতে পারে। দয়া করে বলুন আপনি—

'আমি কবি-কর্ম ছেড়ে বর্তমানে, নিজের 'রুটির' জন্য কমোভয়ান'-এর কাজ শুরু করেছি। ধানবাদ, ঝরিয়া, জামশেদপুর

এবং কলকাতার বহু গোপন ক্লাব এবং ডিসকোথেকস-এ 'শো' দেখিয়েছি…'

'সরাসরি বলছেন না কেন 'ভাঁড়ামি করি।' সূর্যনাথ ঠেট বিহারীবাবুর মত বলে।

'না, ভাঁড়ামি নয়। এ এক নতুন ধরণের ট্রেড, যার নাম আপনার গ্রেট গ্র্যাণ্ডফাদারও শোনে নি। আমি গালাগাল দিই। নোংরা গেঁয়ো এবং অশ্লীল অশ্রাব্য গালাগাল।'

'সেই যে 'সাই' সেজে সকাল-সন্ধ্যে মোরাদপুরের গলিতে ঘুরে বেড়ায়—একটা পয়সা নেবো, পাঁচটা গালাগাল দেবো। বেছে-বেছে গালাগাল দেবো, বাপ-ঠাকুরদাকে গালাগাল দেবো—'

সূতপুত্র বলে, 'এই কমেডিয়ান কারবারে আমার ট্রেড নাম—ডগলাস। অর্থাৎ এখন আমি ডগলাসের ভাষায় আপনার সঙ্গে কথা বলবো। বর্তমানে, গালাগাল এবং অপশব্দ ভোজপুরী থেকে ইংরেজীতে অনুবাদ করে ব্যবহার করি। কিন্তু, এমন ঘরোয়া পরিবেশে শুদ্ধ মগধী বা মৈথিলীতেও—'

সূর্যনাথ একবার ভাবে, এবার একে ফ্ল্যাট থেকে সসম্মানে বার করে দেবে; কিন্তু কিছু ভেবে কিছুটা সময় ওকে সহ্য করে—যাই হোক না কেন, সেই 'গবেষক-ছাত্রের' চেয়ে ত ভালো। যে কয়েকদিন আগে, নিজের মৌলিক বিষয় 'হিন্দী সাহিত্যে রাম-ঘরানা'—র মাল-মশলাব জন্য এসেছিল। ছাত্ররাম অনুসন্ধান নয়, অনুনয় করেছিল, 'স্যার! এমন সাহিত্যিক, যার নামের শুরু, মধ্য বা শেষে 'রাম' শব্দ যুক্ত আছে, তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং কৃতিত্বে 'রাম' এর প্রভাব প্রমাণিত করে—আজ্ঞে, শৈশবে আপনাকে কেউ, কখনও, রাম সূরজনাথ নিশ্চিত ডেকে থাকবে। এই গ্রাউণ্ডে যদি আপনাকেও 'রামঘরানা'র সঙ্গে যুক্ত করে নিই, আপনার কোন আপত্তি নেই তো?'

সূর্যনাথ শান্ত চিত্তে বলে, 'আপনি অভূতপূর্ব কাজ করছেন।

গালাগাল দিয়ে লোকেদের হাসান। লোকেরা প্রসন্ন হয়ে আপনাকে পয়সা দেন।'

'যা-তা হাসি নয়। একেবারে কলজে-ফাটা লাফ! বুঝলেন?' ডগলাস বলে ওঠে।

'আমাদের জেলায় এক রাজাসাহেব তাঁর দরবারে এক 'বুড়িরাজ' অর্থাৎ 'মূর্খরাজ' রাখতেন—'

'আইক্-স্না য়োর রাজাসাহেব! আপনি সামন্ততন্ত্রের কথা বলতে শুরু করেছেন, তারপর? আমি হঠাৎ আঘাত করে বস্তুস্থিতির সঙ্গে অবগত করানোয় বিশ্বাস করি।' ডগলাস বলে।

'ডগলাস সাহেব! আমি জানি না আপনি কি 'শো' করেন, তবে আজ থেকে ত্রিশ 'বছর আগে সেই 'বুড়িরাজ' যে তামাশা আমি দেখেছিলাম, আমার ধারনা তা থেকে একটার বর্ণনা শুনেই বুঝতে পারবেন। আপনি এটা আপনার নিজের কাজেও ব্যবহার করতে পারেন।'

ডগলাস রাজী হয়। সূর্যনাথ শুরু করে, 'রাজার মেলায় বড় বড় নাম করা পালোয়ানদের কুস্তি হতো। একবার, এক চ্যাম্পিয়ান পালোয়ান সব-কটাকে আছাড় দিয়ে, গর্বে বুক ফুলিয়ে তুলকি চালে আখাড়ায় চক্কর কাটতে থাকে—অর্থাৎ—হ্যায় কোঈ মাইকালাল তো আজা ময়দান মে! 'বুড়িরাজ তা' খেয়ে, আখাড়ায় লাফিয়ে পড়ে। শরীরের সমস্ত কাপড় ছুঁড়ে ফেলে 'আ-জা-জা' বলে ঐ চ্যাম্পিয়নের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাল ঠুকতে-ঠুকতে। সমবেত জনতা একসঙ্গে ঠা-ঠা হেসে ওঠে। চ্যাম্পিয়ন পালোয়ান কিছুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর, হঠাৎ পালায়। এক বিশালকায় মানুষকে, একটা উলঙ্গ-রোগা পুঁচকে লোকের ভয়ে ও ভাবে পালাতে দেখে সমবেত জনতা হাসতে-হাসতে বেদম হয়ে পড়ে।'

ডগলাসের এ গল্প ভাল লাগে, 'আমি এর ওপর 'ওয়ার্ক' করে একে রিফাইন করে ব্যবহার করবো—আমি সম্প্রতি একটা 'স্ক্রিপ্ট'

তৈরী করেছি। একজন লোক পেচ্ছাপ করার জন্য দুপহর রাতে হোটেলের কামরায়, কি ভাবে 'ওয়াশ-বেসিনে'—'

সূর্যনাথ এমন সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজী নয়। হ্যাঁ, এটাই —ব্রেকিং পয়েন্ট! মৃদু হেসে সে ডোগলাসসাহেবকে বাধা দেয়— 'ওমা। সেই যে পাদরী সম্পর্কিত প্রহসন—এ তো, আমেরিকান কমেডিয়ান লেনী ক্রসের সৃষ্টি। আজ থেকে দশ-এগারো বছর পূর্বেই উনি এর অভিনয় করে প্রচুর খ্যাতি পেয়েছেন। আপনি বলছেন—'

লেনীক্রুসের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে ডগলাসের চেহারা সহসা নিভে যায়, 'আপনি লেনীক্রুসকে জানেন। আইকৃস্লা আপনি লেনীক্রুসের সম্পর্কে জানলেন কি করে?'

'শুধু জানিই না, ১৯৬৪ সালে তাঁর রেহাই'র জন্য 'আপীলে' আমি স্বাক্ষর দিয়েছিলাম। আজ পর্যন্ত আমার বহু পলিটিকাল বন্ধু সেই স্বাক্ষরের জন্য আমাকে গালাগাল দেয় এবং দুর্নাম করে যে আমি—আইক-স্লা—কিন্তু, এখন লেনী সাহেব স্বর্গের দেব-দেবীদের গালাগাল দিয়ে খুশী করছে। অতএব, এখন আপনি এই ট্রেণ্ডকে ভারতীয় আভাগার্দে ঘোষিত করতে পারেন।' সূর্যনাথ ঘড়ি দেখে।

ডগলাস সাহেব, সূতপুত্রের মাথা থেকে নেমে পড়ে। সূতপুত্র তোতলাতে থাকে, 'এবার আমি কাজের কথা বলি—আমার কাছে মা'য়ের ডায়রী আছে। ডায়রী অনুসারে আপনিই আমার জনক এবং আমি আপনারই প্রজা—'

'অসম্ভব।'

'অসম্ভব নয়। আপনারই ক্রোমোজোম যা—আপনি ভয় পাবেন না। আমি আপনার সম্পত্তির দাবী করবো না।'

'ডায়রী আপনার কাছে আছে, এখানে?'

সূতপুত্র ব্যাগ থেকে ডায়রী বার করে পাতা ওল্টাতে থাকে।

বলে, 'আপনি তো ভাল বাংলা লিখতে-পড়তে জানেন। পড়ে দেখুন।'

সূর্যনাথ দেখে, হাতের লেখা আভারানীর। লিখেছে, 'আজ সূর্যদা আমার সঙ্গে যা করলেন, আমার জীবনে আর কেউ করেনি—'

সূতপুত্রের চেহারা পুনরায় দপ্ দপ্ করতে থাকে। সূর্যনাথ জিজ্ঞেস করে, 'যে 'মাদার' আপনাকে ডায়রী দিয়েছে, সে নিশ্চয়ই আপনাকে 'ডেট অফ বার্থ'ও দিয়ে থাকবে।'

'অফ কোর্স—ছাটস্ দেয়ার। ডায়রীতেই লেখা আছে!'

'আপনি কি এই রোজনামচার তারিখের সঙ্গে জন্মতিথি মিলিয়ে দেখেছেন?'

'আপনি এমন জলন্ত প্রমাণকে মিথ্যে করতে পারেন না, পিতাঠাকুর!'

সূর্যনাথ তার সুরে সুর মিলিয়ে বলে, সূতপুত্র রত্ন! আপনি স্বীকার করুণ আর নাই করুণ বয়ে গেছে। আমি জানি এটা সত্যি নয়। আসলে—আকর্ষণ থাকা স্বত্বেও আভারানীর সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। কামাতুরা সুন্দরীর সঙ্গে নিরিবিলিতে সেই মুহূর্তে আমি মদনোন্মত্ত অবশ্য হয়েছিলাম। কিন্তু—কিন্তু—সেই লাবণ্যময়ী লাস্যময়ী রমনীর মুখ থেকে এমন উৎকট দুর্গন্ধ, আমি সঙ্গে সঙ্গে বিরক্ত হয়ে পড়ি—'

'দুর্গন্ধ?'

'হ্যা! বদ্‌গন্ধ! অমন সুন্দর আকর্ষনীয় মুখশ্রী। অমন সুরেলা কণ্ঠস্বর আর মধুর কীর্তন—আর ঐ মুখ থেকে পচাগন্ধ? ওহ্! আজও মনে পড়লে বমি পায়।'

সূতপুত্রের মুখ থেকে হাল্কা-ধরনের আর্তনাদ বেরিয়ে পড়ে। সে থর-থর করে কাঁপতে থাকে। তার চোখ জ্বল-জ্বল করে ওঠে। কিছুক্ষণ সে কিছু বলতে পারে না—

সূর্যনাথ এবার বুঝতে পারে, এই ছোকরাকে এতক্ষণ সহ্য করার

এও এক কারণ যে মাঝে-মাঝে এর চেহারায় আভারই মুখশ্রীর সরলতা ঝিলিক মারে। সে শান্ত স্বরে বলে, 'কিন্তু আপনি অসংস্কৃতি এবং অপরম্পরা-র এত গোঁড়া সমর্থক হয়েও বাবাকে কেন খোঁজ করছেন ?'

'আইক্-স্লা খোঁজ করছি না। গত আট-ন বছর ধরে আমার মনে এই ধারনা দৃঢ় হয়েছিল যে আমার বাবা একজন্য প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক। আমার শিরায় বহমান রক্তের সম্পর্ক একজন মহান শিল্পির সঙ্গে—বাবাকে শত্রু মনে করে আমি অশেষ শক্তি পেতাম। এরই সাহায্যে আমার সব কিছু—আমার প্রেরণার মূল স্রোত সহসা শুকিয়ে গেল—'

সে নিরুদ্দিষ্ট বালকের মত ডুকরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। সূর্যনাথ ভাবতে থাকে—কবচ-কুণ্ডলহীন 'কর্ণ'ও কি এভাবে কেঁদেছিল ?— তার ইচ্ছে হয় আভারানীর ক্রন্দনরত ছেলের চুলে হাত বুলিয়ে দিয়ে চুপ করায়। কিন্তু সহানুভূতি, দয়া, করুণা এবং কোন ধরনের কৃপার গন্ধ পেলেই এ ছেলে সঙ্গে সঙ্গে রেগে গালাগাল দিতে শুরু করবে। ভায়লেণ্টও হতে পারে। সে বলে, 'এবার আপনি যান আগুণখেকো বাবু ! আমার এখন একটু নিরিবিলির প্রয়োজন।'

সূত্রপুত্র সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ। আই অ্যাম এ ফায়ার ইটার—আগুনখেকো ! ঠিক আছে, এই নামটাও রইলো। আইক-স্লা—'

— ——